প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৫

প্রকাশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিন্যু, কলিকাতা-২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

'আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন' গ্রন্থে সংকলিত নিবন্ধগুলি ইতঃপূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ('শনিবারের চিঠি', 'ক্রান্তি', 'আনন্দবাজার শারদীয়া', 'তরুণের স্বপ্ন', 'উজ্জ্বল ভারত', 'সপ্তর্ষি' ও 'মানস') প্রকাশিত হয়েছিল। নিবন্ধগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও তাদের ভিতর একটি প্রচ্ছন্ন যোগসূত্র রয়েছে। যেমন, সাহিত্যে আদর্শবাদের স্থান, সাহিত্যের ত্রিধারা, বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক যুগ প্রভৃতি নিবন্ধে সাহিত্যে আদর্শবাদ, ঐতিহ্যচেতনা, জাতীয়তা ও সমাজকল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিচক্ষণ পাঠকমাত্রেই জানেন এই সব বিষয়ের মধ্যে পরস্পর-সম্পর্ক রয়েছে। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, শিল্পী ও জীবনশিল্পী, নীতিবাদ ও নেতিবাদ প্রবন্ধে সমাজজীবনের পটভূমিতে শিল্পীর ভূমিকা ও দায়িত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিল্পানুভূতির সঙ্গে নীতিবোধের সংঘর্ষ ও সংঘাতের প্রশ্নটিও এই তিন নিবন্ধে বহুল-আলোচিত। সাহিত্য ও সমাজ, সাহিত্য ও সজ্ঞ প্রবন্ধদ্বয়ে সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যপক্ষে, সাময়িক সাহিত্যের বিচার ও সমালোচকের দায়িত্ব প্রবন্ধদ্বয়ের মধ্যে একালীন সাহিত্য-সমালোচকের বিশিষ্ট সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের চার পুরুষ এবং সাহিত্য ও মধ্যবিত্ত মানসিকতা প্রবন্ধ দুটিতে বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যপক্ষে, সাহিত্যের ত্রিধারা নিবন্ধে প্রসঙ্গতঃ আছে আধুনিক বাংলা কাব্যের আলোচনা। চিন্তা-সাহিত্য নিবন্ধটি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের আলোচনা। পরিশেষে, সাহিত্যে গণতন্ত্র নিবন্ধটিতে নিরবচ্ছিন্ন ভাষা-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই হল এ বইয়ের মোটামুটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা ও এই পরিকল্পনার রূপায়ণের দ্বারা যদি সাহিত্যপাঠকসমাজ কিছুমাত্র উপকৃত হন তবেই লেখকের শ্রম সার্থক।

বইটির প্রকাশে 'জিজ্ঞাসা'র আদর্শনিষ্ঠ উদ্যমশীল প্রকাশক শ্রীযুক্ত শ্রীশকুমার কুণ্ড বিশেষ যত্ন নিয়েছেন; তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বইটির নামকরণে সাহায্য করেছেন আমার তরুণ লেখক-বন্ধু শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত। প্রেস যেরূপ ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সঙ্গে বইটির মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করেছেন সেজন্য তাঁরাও আমার ধন্যবাদের পাত্র।

১৯ ভাদ্র ১৩৬৫ — গ্রন্থকার

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

সঙ্গীত-পরিক্রমা

বাংলার সাহিত্য

বাংলার সংস্কৃতি

সমকালীন সাহিত্য

অম্ল-মধুর

অথ বর্ণপরিচয়কথা

আত্মদর্শন

মহাপ্রাণ হরেন্দ্রকুমার

॥ সূচীপত্র ॥

সাহিত্যে আদর্শবাদের স্থান

সাহিত্যের উপর আদর্শবাদের কতখানি ও কী পরিমাণ প্রভাব থাকা উচিত এই নিয়ে বিতণ্ডার অন্ত নেই। এই বিতণ্ডার সুমীমাংসা বোধ হয় সম্ভব নয়, কেন না দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্য আর তারতম্য থেকে এই বিতণ্ডার উদ্ভব, আর এই বৈচিত্র্য মানবস্বভাবে মজ্জাগত। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে বলেই বিতণ্ডা আছে, এই পার্থক্যের বিলোপ যখন সম্ভব নয় তখন বিতণ্ডার অবসানও অকল্পনীয়।

তবু সাহিত্যের আলোচনায় এই প্রসঙ্গটির বিশেষ মূল্য আছে। বারে বারে আমাদের এই সমস্যাটির সম্মুখীন হওয়া দরকার--আর কোন কারণে নয়, সে এইজন্য যে সাহিত্য বনাম আদর্শবাদের প্রশ্নে আমরা সাহিত্যসেবীরা ও সাহিত্যের ভোক্তারা কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তা যাচাই করা এর দ্বারা সহজতর হয়। সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের কার কী রকম মনোভাব সেটি সুনির্ণীত হয়ে গেলে প্রত্যেকেরই কাজ অনেকখানি পরিমাণে সরল হয়, স্ববিরোধী জটিল মনোবৃত্তির ঘূর্ণাবর্তে তা হলে আর পাক খেয়ে ফিরতে হয় না। বর্তমান আলোচনায় আমরা সাহিত্য ও আদর্শবাদের প্রশ্নটি আবার নূতন করে বিচার করবার চেষ্টা করব।

কিন্তু গোড়াতেই আমাদের স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন, আদর্শবাদ বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি। এই সংজ্ঞা (definition) নির্দেশের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সংজ্ঞার অস্পষ্টতা থেকেই যত গণ্ডগোলের উৎপত্তি। বিতর্কাধীন বিষয়টি সম্পর্কে যদি এক-একজনার এক-এক রকম ধারণা থাকে তা হলে কোনপ্রকার আলোচনাই সম্ভবে না। অধিকাংশ বিতর্কেরই যে শেষ অবধি ভরাডুবি ঘটে তার জন্য দৃষ্টিভঙ্গীর অনৈক্য যেমন দায়ী তেমনই সংজ্ঞার্থের পরস্পরবিরুদ্ধ ধারণাও কম দায়ী নয়। ন্যায়শাস্ত্রে সংজ্ঞার গুরুত্ব অসীম। সুতরাং 'আদর্শবাদ' বস্তুটির স্বরূপ একবার এক-নজর পরখ করে নেওয়া মন্দ নয়।

আদর্শবাদ আমরা তাকেই বলব যার মধ্যে মানবকল্যাণের ধারণা স্বতঃই অনুস্যূত হয়ে আছে। যে কোন বড় আদর্শেরই মূল কথা হল মানবকল্যাণ।

ব্যষ্টিগত না হয়ে সমষ্টিগত হলে তার মূল্য আরও বেশী। সামগ্রিক মানব-কল্যাণের অভীপ্সা ও আকূতিকে আমরা শ্রেষ্ঠ আদর্শবাদ আখ্যা দিতে পারি। কিন্তু আদর্শবাদ শুধু উদ্দেশ্যের ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তাকে বাস্তব জীবনের কাজের ভিতর রূপায়িত করে তুলতে হয়, আর এই বাস্তব চর্যায় অনেকখানি ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন হয়। আদর্শবাদের সঙ্গে ত্যাগের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। সাহিত্যে আদর্শবাদের দাবি মানতে গেলে এই ত্যাগস্বীকার অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

সাহিত্যে ত্যাগস্বীকার কী রকম। এই ত্যাগ কি সাহিত্যকর্মীর জীবনকে আশ্রয় করে রূপলাভ করবে, না কি তা তাঁর সাহিত্যের মধ্যেও অভিব্যক্ত হবে? আমরা বলব—উভয়তঃ, তবে আপাততঃ আমরা সাহিত্যিকের জীবন নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না, সে এ নিবন্ধের এলাকাধীন ব্যাপারও নয়; এখানে বক্তব্য এই যে, স্রষ্টার মনের ত্যাগকামনাকে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে রূপায়িত করে তোলার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। সাহিত্য যদি ভঙ্গীমাত্র না হয়, সৌন্দর্য-সৃষ্টির অজুহাতে নিছক কথা সাজাবার খেলা না হয়, তা হলে এই ত্যাগ ও সংযম স্রষ্টার মনের মধ্যে গ্রথিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আর সাহিত্যেও ওই মনোভাবের অভিপ্রকাশ বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ইউরোপীয় সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে Art for Art's sake, শিল্পের জন্যই শিল্প—মতের উদ্ভব হয়েছিল ষোল-আনা শিল্পভাবনায় ভাবিত সাহিত্যিকদের প্রবর্তনায়। আমাদের পরিভাষায় আমরা ওই মতের প্রবক্তাদের কলাকৈবল্যবাদী বলতে পারি। অস্কার ওয়াইল্ড ছিলেন কলাকৈবল্যবাদীদের শীর্ষাধিপতি। এক সময়ে সাহিত্যিক সমাজের উপর এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব সবিশেষ বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু আজকের মানদণ্ডে এই দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব, ওই মতবাদ ভোগসুখলিপ্সু, প্রমোদবিলাসী, শৃঙ্খলা ও সংযমনীতির পরিপন্থী; উপরন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় শিল্পমনস্ক। শিল্পকে জীবনের সঙ্গে সমীকৃত করতে গিয়ে ওই মতের প্রবক্তারা শিল্পকে যে পরিমাণ প্রাধান্য দিয়েছেন জীবনের দাবিকে ততটাই খর্ব করেছেন। শিল্প যে জীবনের একটি দিক্ মাত্র, জীবনের আরও বহু বহু দিক্ আছে এবং সে সকল দিকের কোন-কোনটি যে শিল্পের চেয়ে কিছুমাত্র কম মূল্যবান নয়—এই বোধ এঁদের রচনায় অনুপস্থিত। এঁরা সত্যের সন্ধানী নন, সাহিত্যের মাধ্যমে স্থূল বাক্যবিলাসের কারবারী মাত্র। বাক্যচ্ছটায় আর নিপুণ শব্দের প্রয়োগে এঁরা পাঠকচিত্ত জয়ের প্রয়াসী।

আনন্দ এঁদের লেখনীতে নিছক আমোদে পর্যবসিত। আদর্শবাদী মনোভাবকে এঁরা পাশ কাটিয়ে চলতেই অভ্যস্ত। এঁদের রচনায় আদর্শবাদের দাবি স্বীকৃত নয় বলে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচেতনাকে কল্যাণভাবনার দ্বারা নিয়ামিত করার, কট্টর বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গীকে সংযমচেতনার দ্বারা শাসিত করার প্রয়োজনও তথায় স্বীকৃত নয়। কলাকৈবল্যবাদীদের চোখে সাহিত্য জীবন থেকে বিযুক্ত একটি মূলহীন তরু ; মৃত্তিকার জীবনীরস থেকে বঞ্চিত এই তরু ফুলের শোভা বিস্তার করতে গিয়ে দুদিনেই শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে। এ তরুতে বড়জোর মরশুমী ফুলের আভাস পাওয়া যেতে পারে, ফলদানের ক্ষমতা এ বৃক্ষের নেই।

বিশ শতকের প্রথম যুদ্ধোত্তর পর্বে কলাকৈবল্যবাদীদেরও এককাঠি উপরে উঠলেন ডি. এইচ. লরেন্স-প্রমুখ অতিমাত্রায় আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী শিল্পিগণ, যাঁদের মূলমন্ত্র হল : Art for *my* sake। অর্থাৎ নিজের জন্যেই লেখা, স্বকীয় উদগ্র আত্মপ্রকাশের তাড়নার ফল সাহিত্যসৃষ্টি, সে সৃষ্টির সৌন্দর্য ও রস অপরের মনে সঞ্চারিত হলে ভাল, না হলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই দৃষ্টিভঙ্গী পুরাপুরি মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক, আত্মপরায়ণ। এই শিল্পদৃষ্টির মধ্যে সাহিত্যের প্রচলিত ধারণা অনুপস্থিত, অপরের সহিত সহিতত্ব প্রতিষ্ঠার কোন কথা এর ভিতর নেই ; পরন্তু পাঠকসাধারণের সঙ্গে ভাবের যোগ সংসাধনের প্রয়োজন এখানে বহুলাংশে উপেক্ষিত, এমন কি পরিত্যক্ত। কলাকৈবল্যবাদীদের চেতনায় তবু বরং আর্টের দাবি স্বীকৃত ছিল ; এখানে আর্টকেও ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে আমিত্ব। এখানে আর্ট সম্পূর্ণই অহং-এর অধীন ও অনুগত। এ রাজ্যে পরস্মৈপদী বিধানের স্থান নেই ; আত্মনেপদী বিধানটাই এখানকার একমাত্র রীতি।

এই-যে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন মতবাদ, এ থেকেই পরবর্তী পঁচিশ বছরে নিছক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী আত্মকেন্দ্রিক সাহিত্য-আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে। ইউরোপ তথা আমেরিকাতেই এর প্রসার সীমাবদ্ধ থাকে নি, আমাদের সাহিত্যেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। বাঙালীর সবিশেষ স্বাতন্ত্র্যবাদী মেজাজের জন্য এই ঢেউ একটু বেশী মাত্রাতেই বাংলার কোন কোন লেখকের মনের তীরে এসে ঘা দিয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক দিকে ঐতিহ্যাশ্রিত সাহিত্যসাধনা অন্য দিকে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসের মাঝখানে আর একটি যে তৃতীয় ধারার সাহিত্যচেতনা গড়ে উঠেছে তা এই পাশ্চাত্ত্য মতবাদের প্রভাবেরই ফল। ইউরোপীয় জীবনদর্শন ও ইউরোপীয়

শিক্ষাদীক্ষার প্রতি মোহ যে এই প্রভাববিস্তারে বিশেষ কার্যকর হয়েছে তা আশা করি না বললেও চলে। এবং বলাই বাহুল্য যে, এই প্রভাবের মূল দেশজ ঐতিহ্যের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, বিদেশের সাম্যবাদী আদর্শাশ্রিত সমষ্টিবাদনির্ভর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ একেবারেই ব্যক্তি-আশ্রয়ী, মনোনিবদ্ধ, অহংবিলাসী। নিজের মনের গভীরে তলিয়ে গিয়ে সম্ভব-অসম্ভব, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক, সুস্থ-অসুস্থ চিন্তা ও কল্পনা নিয়ে নাড়াচাড়া করাতেই এই মতবাদে আস্থাশীল শিল্পীর সুখ; মনোরাজ্যের ওই আলো-আঁধারির জটিল জল্পনা অপরে হৃদয়ঙ্গম করতে পারল কি না সে সম্বন্ধে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। এই-যে একান্তভাবে subjective শিল্পধারা, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তারই কয়েকজন সুচিহ্নিত প্রবক্তা হলেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রমুখ পাশ্চাত্যভাবাশ্রয়ী কবিকুল। এঁদের অত্যধিক পাশ্চাত্যবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এঁদের একেবারেই বাংলা দেশের প্রবহমান শিল্পধারা থেকে বিযুক্ত করে দিয়েছে।

আদর্শবাদ 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' তত্ত্বের মধ্যেও নেই, 'আর্ট ফর মাই সেক' তত্ত্বের মধ্যেও নেই। এ দুটি মতবাদ সৌন্দর্যসৃষ্টির আত্মপ্রসাদে অহংবুদ্ধিতে বুঁদ হয়ে আছে। এর মধ্যে প্রথমোক্ত শিল্পদৃষ্টির ভিতর সমাজভাবনা অনুপস্থিত; দ্বিতীয় মতবাদে সমাজভাবনা তো নেই-ই, শিল্প-সৌন্দর্যের নিজস্ব দাবিও তথায় স্বীকৃত কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। 'সাহিত্য' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে এবং শিল্পোৎকর্ষের স্বীকৃত লক্ষণাদির মানদণ্ডে সাহিত্যশিল্পের একটি প্রধান কাজ অপরের মনে শিল্পিমনের ভাব সঞ্চার করা, শিল্পস্রষ্টা ও শিল্পভোগীর মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা। সেই অতি-আকাঙ্ক্ষিত কাজটিই যদি শিল্পের মাধ্যমে নিষ্পন্ন না হল তা হলে শিল্প যতই বুদ্ধিলক্ষণাক্রান্ত হোক মনোজীবী হোক, তাতে দেশ ও সমাজের কী যায়-আসে! সাহিত্যের সহিতত্ব ভাবটির মধ্যেই একটা আদর্শবাদ লুক্কায়িত রয়েছে। হিতের সহিত যা বর্তমান তা সাহিত্য, অন্যথায় সাহিত্য নয়। অতিমাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্য স্পষ্টতঃই হিতের সহিত যুক্ত নয়! তার আবেদন সমধর্মী দু-চারজন উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তির নিকট সত্য হতে পারে, দেশবাসীর জীবনের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। এমন সাহিত্য পাঠকমনে খুব বেশী শ্রদ্ধাবোধের উদ্রেক করে না।

এখানে আরও একটি কথা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। আর্টবাদীদের একটা মস্ত বড় দোহাই এই যে, যা সুন্দর তা-ই নাকি কল্যাণপ্রসূ। সুন্দর তার সৌন্দর্যের দ্বারা স্বতঃই কল্যাণবিধানের ক্ষমতার অধিকার অর্জন করে। এই যুক্তিটি সৌন্দর্যবাদীদের খুবই মনোমত এবং বিপক্ষের অভিযোগ খণ্ডনে প্রায়ই ওই লাগসই যুক্তির প্রয়োগ হয়ে থাকে। সমাজ বা বৃহত্তর পাঠক-সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্বচ্যুতির স্খালন এঁরা সচরাচর এই যুক্তির আশ্রয়েই নিষ্পাদন করবার চেষ্টা করেন। যে জিনিস সুন্দর তার শত দোষ মাফ। তার আর দায়দায়িত্ব থাকতে নেই। সে আপনাতে-আপনি-বিকশিত বৃন্তহীন একটি পুষ্প, তার সৌন্দর্যই তার শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র নিশানা। সৃষ্ট বস্তুর সৌন্দর্যের দ্বারা যদি ভোক্তার মন-প্রাণ ভরে যায় তা হলে ওই সৌন্দর্যই সহস্রবিধ কল্যাণের আকর হয়ে ওঠে। সৌন্দর্য নিজেই নিজের মানদণ্ড, নিজেই নিজের পরিমাপ, তাকে আর-কিছু দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। আদর্শবাদ বল সমাজকল্যাণ বল জাতিপ্রেম বল, সবই ওই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ধারণার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে।

যুক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। একে সরাসরি অগ্রাহ্য করা যায় না, সে কথা অকপটে স্বীকার করব। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই যুক্তির মধ্যে কিঞ্চিৎ ফাঁক ও ফাঁকি আছে। সুন্দর জিনিস স্বতঃই কল্যাণপ্রসূ হয় বেশ বোঝা গেল; কিন্তু কিসে বস্তু সুন্দর হয় কিসে বা অসুন্দর, তা স্থির করবে কে? সৌন্দর্যের সংজ্ঞা কী? সৌন্দর্য-নিরূপণের মাপকাঠি কী? আমরা সাহিত্যের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছি, সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশ্নটির বিচার হোক। কোন্ আর্টকে আমরা সুন্দর বলব? সাহিত্যে কোন্ শ্রেণীর রচনা সৌন্দর্যের শিরোপালাভের যোগ্য?

ধরুন মহাভারতের শকুন্তলার গল্প বা চিত্রাঙ্গদার গল্প। এই গল্প দুটি প্রাচীন কবির লেখনীমুখে যে রূপ লাভ করেছে তার মধ্যে একই কালে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও আদর্শবাদের দাবি পরিপূরিত হয়েছে, সুতরাং তারা শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের ভিতর তপোবনের নিভৃতিকে আশ্রয় করে যে প্রেম উপজিত হল তা দেহসর্বস্ব হলেও সুন্দর এক প্রেমের আলেখ্য। কিন্তু মাত্র ওই দেহের সীমার মধ্যেই যদি ওই আলেখ্যের রূপায়ণ সীমাবদ্ধ থাকত তা হলে গল্পটি তথাকথিত সুন্দর আর্ট (good art) হলেও মহৎ আর্ট (great art) হত না। মহৎ আর্ট মাত্রই আদর্শবাদী

অভীপ্সার দ্বারা পরিপূরিত, কল্যাণভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। আর সেই কারণে—অর্থাৎ সৌন্দর্য ও আদর্শবাদের সমন্বয়হেতু—যথার্থ সৌন্দর্য একমাত্র ওই আর্টের মধ্যেই নিহিত। আলোচ্য গল্প মহৎ আর্টের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে শকুন্তলার অপরিমেয় দুঃখসহনের তপস্যার দ্বারা। দুঃখের আগুনে শকুন্তলার প্রেম পরিশুদ্ধ হয়েছে। কবি গ্যেটে ও কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষা অনুসরণ করে বলি, ভোগ এবং ত্যাগ, স্বর্গ এবং মর্ত্য এখানে একসূত্রে বাঁধা পড়েছে। শকুন্তলা নিছক ভোগের চিত্র হলে তা সাহিত্যপাঠকের মনে শতাংশের একাংশও প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। সে ক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজের দ্বারা তার গ্রাহ্য হবার সম্ভাবনাও ছিল নিতান্ত অল্প।

যেমন শকুন্তলার গল্পে তেমনই চিত্রাঙ্গদার গল্পে তেমনই শিব-পার্বতীর কাহিনীতে। এই গল্পগুলির মধ্যে ভোগের সঙ্গে ত্যাগ একসূত্রে গ্রথিত রয়েছে বলেই এদের অন্তর্নিহিত শিল্পসৌন্দর্য এমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যার সার্থকতা দেখি না, রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই তাঁর প্রতিভামণ্ডিত অননুকরণীয় ভাষায় এই বিশ্লেষণ সমাধা করে গেছেন। এখানে শুধু বক্তব্য, নিছক তথাকথিত সৌন্দর্যের দাবিতে শিল্পকর্ম সৌন্দর্যভূষিত হয় না, সেই সঙ্গে জীবনজিজ্ঞাসার দাবি পূরণ করতে হয়, সমাজকল্যাণের দাবি পূরণ করতে হয়, প্রজ্ঞা বা wisdomএর দাবি পূরণ করতে হয়। আর্টের সৌন্দর্য বহু উপকরণের সমবায়ে তৈরী এক বিচিত্র সৃষ্টি।

পুরাতন সাহিত্যের প্রসঙ্গ থাক্। সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য থেকে দু-একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। গত কয়েক বছরের শারদীয় সংখ্যাগুলিতে অনেক গল্প, বড়গল্প প্রকাশিত হয়েছে, শেষোক্ত শ্রেণীর রচনার কোন-কোনটি উপন্যাসের পর্যায়ে গিয়ে উঠেছে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে পরিবেশিত শারদীয় সাহিত্যসম্ভার সম্পর্কে আজকাল যদিও আমাদের পূর্বতন উৎসাহ অনেক মন্দীভূত হয়ে গেছে, তা হলেও এরই মধ্যে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত কিছু-কিছু রচনা নেড়ে-চেড়ে দেখবার সুযোগ হয়েছে। দেখা গেল, যে-রচনার পরিকল্পনা ও গঠনের মধ্যে আদর্শবাদের উপাদান আছে তা-ই পাঠকমনকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে এবং সমাজের উপর তারই প্রভাব পড়ে সবচেয়ে প্রবলভাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিচারক" ও "সপ্তপদী" নামক বড়গল্প দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এমন নয় যে, এই গল্প দুটির রচনারীতি সর্বাংশে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করে—তারাশঙ্করের পরিবেশনার

ধরনটাই এমন যে তার মধ্যে লেখকের রুচির স্থূলতা ও গ্রামীণতা কোথাও না কোথাও প্রকট হয়ে ওঠেই—যেমন "সপ্তপদী" গল্পে কলেজের ফুটবল খেলার বিবরণ ও বারংবার ওথেলো থেকে উদ্ধৃতি পাঠকের ওষ্ঠপ্রান্তে অলক্ষিত হাস্যেরই শুধু উদ্রেক করবে, কিন্তু এ সকল নিতান্তই বহিরঙ্গের বিচার। আসল গল্পের মূল্যায়নে এ সকল সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বাধাস্বরূপ গণ্য হওয়া উচিত নয়। তারাশঙ্করের রচনায় এমন কিছু একটা আছে যা সাম্প্রতিক কালের অন্যান্য গল্পোপন্যাসকারদের রচনায় পাওয়া যায় না, অন্ততঃ তুলনীয় মাত্রায় পাওয়া যায় না এ কথা নিশ্চিত। সেই 'এমন কিছু একটা' কী যদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তা হলে দেখা যাবে সেটি আর কিছু নয়, লেখকের মনোগঠনের মধ্যে মজ্জাগত সুস্পষ্ট আদর্শবাদ। আদর্শবাদী আকৃতি ও অভীপ্সায় তারাশঙ্করের শিল্পজীবন ভরপুর এবং এটি এমন এক দৈব বৈশিষ্ট্য যার প্রসাদে তাঁর মাথা আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে গেছে। তারাশঙ্কর অমার্জিত শিল্পী, কিন্তু অপরিসীম হৃদয়বান মানবপ্রেমী শিল্পী।

শিল্পীর এই সু-উচ্চারিত আদর্শবাদ "বিচারক" ও "সপ্তপদী" গল্প দুটিকে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করেছে। সূক্ষ্ম ন্যায়-অন্যায়ের চুল-চেরা পরিমাপের প্রশ্নে বিচারকের মনের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব কিংবা রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামীর ফলপ্রত্যাশাবিহীন নীরব মানবসেবার আদর্শ গল্পের সূচনাতেই গল্পকে এমন উচ্চগ্রামে নিয়ে তোলে, সৌন্দর্যব্যবসায়ী কথাসাহিত্যিকেরা অনেক বাক্যজাল ছড়িয়ে আর অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও সে স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারেন না। গল্পের সুর যদি নীচু পর্দায় বাঁধা থাকে আর নিছক অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রণয়লীলা কিংবা এই-জাতীয় তুচ্ছ কিছু-একটা যদি গল্পের বর্ণনীয় বিষয় হয় তা হলে সে গল্পের ভিতর যত রম্যতা আর যত চারুতাই সাধিত হোক না কেন, তা গল্পকে খুব বেশী দূর নিয়ে যেতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ লেখকের বেলায় এই হয়েছে মুশকিল। এঁরা এঁদের মনোভঙ্গীর অপূর্ণতার জন্য, অনুচিত ক্ষেত্রে পক্ষপাত আরোপজনিত বিচার-বিভ্রমের জন্য, শুরুতেই রচনাকে এমন নিম্নগ্রামে স্থাপন করেন যে তার পর শত চেষ্টাতেও আর তাকে উঁচুতে তোলা সম্ভব হয় না। সকল শিল্পীই তাঁদের নিজ নিজ শিল্পকর্মকে নিটোল একটা বিন্যাসের মধ্যে সুসম্পূর্ণ আকার দান করতে এবং তদ্দ্বারা পাঠকচিত্ত বিনোদন করতে চান। কিন্তু শিল্পকর্ম সুবিন্যস্ত আর সুগঠিত হলেই যে তাতে পাঠকচিত্ত মুগ্ধ হবে এমন কোন কথা

নেই ; পাঠকচিত্তবিনোদনের জন্য, যে যে উপাদানের সমাহারে শিল্পকর্মের গঠন, তার নির্বাচনও সুষ্ঠু হওয়া আবশ্যক। বিষয়বস্তুর তারতম্যে রচনার গোত্রবদল, জাতবদল সাধিত হয়।

এইখানেই আদর্শবাদের কথা এসে পড়ে। কেন না ওই আদর্শবাদের পথ ধরেই সাধারণতঃ বিষয়বস্তুর মহিমা আত্মপ্রকাশ করে। আদর্শবাদের অবর্তমানে স্বতঃই রচনার সুর নেমে যায়, এও পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা। "বিচারক" আর "সপ্তপদী" গল্পে মানবজীবনের দুটি মৌলিক অনুভূতিকে রচনার কেন্দ্রমধ্যে সূচনাতেই গ্রথিত করা হয়েছে—ন্যায়পরায়ণতা ও প্রেমের জন্য সর্বস্বদানের আকুলতা। সকল ধর্মের উপরে যে মানবধর্ম, সেই উদার মানবধর্মের মাহাত্ম্য দুটি রচনাতেই সমান প্রবলতার সঙ্গে কীর্তন করা হয়েছে। আর সেইটিই কারণ, যার জন্য এ দুটি রচনার আবেদন অধিকাংশ সাম্প্রতিক রচনার আবেদন অতিক্রম করে চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করে।

পরবর্তীকালীন কথাকারদের মধ্যে যে মুষ্টিমেয়সংখ্যকের রচনায় আদর্শ-বাদী অভীপ্সা ও আকুলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন সুবোধ ঘোষ। সুবোধ ঘোষের আইডিয়ার প্রতি অসীম অনুরাগ, বস্তুতঃ আইডিয়াকেই ইনি গল্পের আকার দেবার চেষ্টা করেন। আদর্শবাদী অনুপ্রেরণার সূত্রেই যে লেখকের রচনার ওই আইডিয়াজীবিতা, তা একটু বিশ্লেষণেই ধরা পড়বে।

উদাহরণ-পর্যটন থাক্‌। যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল সেই বিষয়ের সূত্রানুসরণে পুনঃপ্রবৃত্ত হওয়া যাক। কলাকৈবল্যবাদ, প্রাতিস্বিক শিল্পবাদ (Art for my sake), সৌন্দর্যবাদ, লীলাবাদ প্রভৃতি যে তত্ত্বের কোঠাতেই সাহিত্যকে আবদ্ধ করবার চেষ্টা হোক না কেন, তা সাহিত্যের সমগ্র ভাবের সঙ্কুলানের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট বলে গণ্য হতে পারে না। সাহিত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য এমন কোন একটি যৌগিক নীতির দ্বারস্থ হওয়া প্রয়োজন, যার মধ্যে আদর্শবাদ, সৌন্দর্যবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি সব কটি শিল্পনীতিরই স্থান আছে এবং সেগুলি তথায় অবিরোধে বিদ্যমান। আমাদের মনে হয় এই দিক দিয়ে টলস্টয় ও রলাঁ-কথিত 'Art for humanity's sake'-নীতিই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ভাবাদর্শ এবং সাহিত্যে এই ভাবাদর্শের অনুশীলনে সবচেয়ে সুফল লাভের সম্ভাবনা। পৃথিবীর বড় বড়

শিল্পী-সাহিত্যিক, তাঁরা তাঁদের শিল্পকর্মের ভিতর প্রত্যক্ষতঃ হোক পরোক্ষতঃ হোক এই সার্বিক আদর্শটিরই পোষকতা করে এসেছেন।

অনেক ছুৎমার্গী সাহিত্যিক ও সমালোচক আছেন, যাঁরা সাহিত্যের এলাকায় কল্যাণভাবনার অনুপ্রবেশের নামেই আঁতকে ওঠেন। যেন কল্যাণচিন্তার সংস্পর্শে সাহিত্যসৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে দূষিত হয়ে গেল, সাহিত্যের লীলা আর লীলা রইল না, তাতে নীতিবাদের ভেজাল ঢুকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও আনন্দের আদর্শটিকে অধঃপাতিত করল। এই ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করেন তাঁরাই, যাঁদের চিত্তবৃত্তিতে কল্যাণচিন্তার তেমন স্থান নেই, যাঁরা সাহিত্যকে আর দশটা বৃত্তির মত নিছক একটা অর্থকরী বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেন এবং চাকুরিতে প্রোমোশনের মত, এগজামিনে পাসের মত, ওই বৃত্তিতে সাফল্য-লাভের আশা করেন। বৈষয়িক ক্ষেত্রে কে কাকে দাবিয়ে বড় হবে এই নিয়ে যেমন অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার অন্ত নেই, তেমনি এই সব কল্যাণভাবনা-বিরহিত নিরবচ্ছিন্ন শিল্পমনস্ক সাহিত্যিকের মধ্যে খ্যাতি ও যশের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষায় সাহিত্যের বাজারে অগ্রস্থান লাভ করবার জন্য পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলি লেগেই আছে। এই ঠেলাঠেলি যেমন অশোভন তেমনই চিত্তবৃত্তির সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। এঁদের মনোগঠনের ভিতর আদর্শবাদের জায়গা থাকলে এঁরা বোধ হয় এমনভাবে বৃহত্তর সমাজের নিকট নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তুলতেন না।

'মানবকল্যাণের জন্য শিল্প'—এই নীতিতে যে সকল লেখক আস্থাশীল তাঁরা সর্বক্ষেত্রেই তাঁদের মনোগত ভাব বৃহত্তর পাঠকসাধারণের হৃদয়ে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেন, আত্যন্তিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখকদের মত আত্মকেন্দ্রিক ভাষা ও ভঙ্গীর আশ্রয়ে নিজেদের চারদিকে দুর্বোধ্যতার জটিল জাল রচনা করেন না। সমধর্মী কিছু-সংখ্যক আভিজাত্যাভিমানী বুদ্ধিজীবীর চিত্তপল্বলে আবেদনের ঢেউ তুলতে পারলেই এঁরা ভাবেন মহৎ শিল্পসৃষ্টির দায় সমাধা হয়ে গেল। কিন্তু সাহিত্যের দায় এত সহজে সমাধা হয় না। সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—আনন্দ এবং কল্যাণ পরিবেশন। এই দুই লক্ষ্যের কোনটিই সিদ্ধ হয় না যদি সঙ্কীর্ণ কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই মুখ্যতঃ সাহিত্যের আবেদন সীমাবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করা হয়—অক্ষমতার বশেই হোক আর স্বলালিত কোন নীতির প্রতি আনুগত্যের বশেই হোক। অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতাযুক্ত লেখকদের দোষই এই যে, তাঁরা তাঁদের প্রশংসনীয়

বৈদগ্ধ্য আর বুদ্ধিবাদ সত্ত্বেও পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশের কোন চেষ্টা করেন না বা ভাবাবেগসমৃদ্ধ কল্যাণাদর্শের দ্বারা নিজেদের সংচালিত করেন না। তাঁরা কৃত্রিম আভিজাত্যের দুর্গে স্বেচ্ছাবন্দী সব মানুষ—এ দুর্গে আদর্শবাদের আলো প্রবেশ করে না, কল্যাণভাবনার হাওয়া বয় না; দুর্গপ্রাকারের সবটাই অহং-বুদ্ধির গাঁথুনিতে নিরেট।

কিংবা কলাকৈবল্যবাদীদের মত তাঁরা (মানবহিতব্রতী লেখকগণ) শুধু কথার ফুলঝুরিই কাটেন না। তাঁরাও শিল্পকর্মকে নিটোল রূপ দিতে চান, আঙ্গিক আর রচনাশৈলীর প্রতি তাঁদের মনোযোগ কিছুমাত্র কম নয়; তাই বলে অন্তঃসারশূন্য বস্তুকে অবলম্বন করে তাঁদের এ শিল্পবিলাস নয়—যদি এঁদের শিল্পকে বিলাস বলাই যায়। অস্কার-ওয়াইল্ডীয় বক্রোক্তির নিপুণতায় কিংবা চেস্টারটনীয় কথার মারপ্যাঁচে কী লাভ, যদি সেই নৈপুণ্যের পিছনে কোন সারসত্যের প্রণোদনা না থাকে। প্রমথ চৌধুরী অথবা রাজশেখর বসু মহাশয়ের wit দিয়ে কী হবে যদি সুগভীর মানবপ্রেমের ভাবাবেগ তাঁদের শিল্পভাবনাকে আলোড়িত নাই করল? এই দুই কুশলী ব্যঙ্গরসিকের রচনা যে শুষ্ক wit-এর স্তরেই আবদ্ধ রইল, হাসি-অশ্রুর ইন্দ্রধনু রচনা করে humour-এ পর্যবসিত হতে পারল না, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত হতে পারল না, তার কারণই বোধ হয় এই যে এঁদের মনোগঠনের ভিতর আদর্শবাদী অভীপ্সার একান্ত অসদ্ভাব। কিন্তু কে এ সকল কথার বিচার করে, কে এ সব তত্ত্বের বার্তা নেয়! এ দেশে সাহিত্যের বিচার তো সাহিত্যের গুণাগুণ দিয়ে হয় না; হয় সংশ্লিষ্ট লেখকের পদমর্যাদার দ্বারা, বনেদিয়ানার দ্বারা, অর্থশক্তির দ্বারা, বাড়ি-গাড়ির জৌলুসের দ্বারা। সুবিধাভোগীদের উদ্দেশে গড় করতে পারলে আমরা আর কিছু চাই না।

সাহিত্যে আদর্শবাদের স্থান আছে এবং সে স্থান খুবই প্রশস্ত। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের এই দিক্ দিয়ে বিশেষ ঘাটতি আছে বলে মনে হয়। এবং সম্ভবতঃ সেইটিই আসল কারণ, যার জন্য সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না। লেখকগণ এই প্রশ্নটির প্রতি আর একটু অবহিত বলে সকলেরই মঙ্গল হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সাহিত্যের ত্রিধারা

সাহিত্যের তিন ধারা—ঐতিহ্যচেতনা, সমসাময়িকতা ও প্রগতিশীলতা। ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আত্মসাৎ করে তদ্দ্বারা চিন্তা ভাবনা কল্পনাকে সমৃদ্ধ করে নিয়ে তারপর যুগধর্ম অনুযায়ী তাদের প্রগতির খাতে চালিত করা- এই হল সাহিত্যিকের পক্ষে প্রকৃত পালনীয় বিধি। অর্থাৎ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ কালেই লেখকের ভাবনার ব্যাপ্তি। লেখকের মনোজীবনের ভিত্তিভূমি হল অতীত, তার প্রাকার উত্তুঙ্গ হয় বর্তমানকে কেন্দ্র করে এবং তার চূড়ায় থাকে ভবিষ্যতের সীমাহীন বিস্তৃতি। লেখকের স্থিতি বর্তমানে, তাঁর সঞ্চয় অতীতের গর্ভ থেকে আহৃত এবং তাঁর কল্পনা ভবিষ্যতে প্রসারিত—এই তিনটি শর্ত একত্র পরিপূরিত হলে তবেই মাত্র কোন ব্যক্তির পক্ষে আদর্শ লেখক হওয়া সম্ভব। অতীতজ্ঞান, সমসাময়িক কাল সম্পর্কে সজীবচেতনা এবং ভবিষ্যদ্দৃষ্টি এই তিনের কোন-একটিতে খাদ থাকলে সাহিত্যিক প্রস্তুতিতে অপূর্ণতা থেকে যায়।

দুঃখের বিষয় এ-জাতীয় অপূর্ণতার দৃষ্টান্তই বেশী চোখে পড়ে। সব রকম বাঞ্ছনীয় গুণের সমাবেশে সমৃদ্ধ সর্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্যিক মন বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা অতীতের কথা বলেন, দেখা যায় তাঁদের ভাবনাচিন্তা শুদ্ধমাত্র অতীতের সীমাতেই সীমাবদ্ধ। অতীতপ্রীতিকে এঁরা প্রায়শঃ বর্তমানবিমুখতার সাফাই হিসাবে ব্যবহার করেন এবং সেইভাবেই তাঁদের চিন্তার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যপক্ষে যাঁরা বর্তমানকালীন ধ্যান-ধারণার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁরাও যেন ভিন্ন এক অর্থে অতীতাশ্রয়ীদের মতই একদেশদর্শী। অতীতাশ্রয়ীরা অতীতনির্ভর, এঁরা একান্তভাবেই বর্তমানের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না, কিন্তু লেখকের কল্পনায় কেবলই যদি বর্তমান নিরবচ্ছিন্ন প্রাধান্য পেতে থাকে তা হলে এক ধরনের মূলহীন চিন্তার উদ্ভব হয়, যার হিতকারী ক্ষমতা অপেক্ষা অনিষ্টকারী ক্ষমতাই বোধ হয় বেশী। আত্যন্তিক সমসাময়িকতার সব চাইতে বড় কুফল সাংবাদিকতা, তার পরেই দৈনন্দিন রাজনীতির কথা বলা যেতে পারে। সাংবাদিকতা বহু শিক্ষণীয় বিষয়ের আকর হলেও তার সব চেয়ে বড় ক্রটী এইখানে যে, তার পরিবেশিত সংবাদ ও মন্তব্যের সঙ্গে অতীতের বিশেষ

কোন যোগ নেই। যাকে আমরা ঐতিহ্য-চেতনা বলি সেই শ্রদ্ধেয় অতীত-সংস্কার খুব কম ক্ষেত্রেই সাংবাদিকবৃত্তিতে প্রেরণা সঞ্চার করে। সাংবাদিক-লেখকগণের উপজীব্য বিষয় একান্তভাবেই বর্তমাননির্ভর, তাঁদের রচনায় ঐতিহ্যের জোর নেই। আর ঐতিহ্যের জোর নেই বলে তাঁদের রচনার স্থায়ী মূল্যও বিশেষ কিছু নেই।

দৈনন্দিন রাজনীতির চিন্তাভাবনাকে ঠিক একই কোঠায় ফেলা যেতে পারে। সাধারণতঃ দৈনন্দিন রাজনীতির লক্ষ্যের ভিতর থাকে জীবিকাগত অভাব-অভিযোগ দাবি-দাওয়া ইত্যাদির পূরণরূপ নিতান্ত সাময়িক কোন তাগিদ। সমসাময়িক খণ্ডিত উদ্দেশ্যের সিদ্ধিতেই দৈনন্দিন রাজনীতির সার্থকতা এবং এইটি একটা কারণ যার জন্য দৈনন্দিন রাজনীতির ভিতর মহৎ কোন ভাবনার বেগ সঞ্চার করা যায় না। তার চিন্তার প্রণালী, প্রকাশরীতি, পরিভাষা সবই শোধনাতীতরূপে বর্তমানকেন্দ্রিক। তার ভাষাব্যবহার আটপৌরে। দৈনন্দিন রাজনীতির সেবক কোন মেঠো বক্তার বক্তৃতা শুনলে মনে হয়, এ ভাষার কোন অতীত নেই, এর সবটাই বর্তমান প্রয়োজনের কোটর থেকে উদ্ভূত। রাষ্ট্রনীতি (Political Science) সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। রাষ্ট্রনীতি রাজনীতির চেয়ে অধিক শ্রদ্ধেয় এই কারণে যে, সাময়িক প্রয়োজন পূরণের চেষ্টার মধ্যেই তার তৎপরতা নিঃশেষিত নয়, যদিও সাময়িক আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রয়োজনাদির বিবৃতিকরণ তার অন্যতম করণীয় বটে। রাষ্ট্রনীতিতে তথ্য অপেক্ষা তত্ত্ব বড়। এবং এই তত্ত্বও আবার হঠাৎ-গজানো সাময়িক কোন ভাবনা নয়, তার পিছনে ঐতিহ্য বর্তমান। দূর কাল থেকে শুরু করে অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির স্বরূপ বুঝতে হলে তার অতীত, মধ্য ও নিকট অতীতের চিন্তার বিবর্তনের ধারাটি বোঝা প্রয়োজন। প্লেটো-আরিস্টটলের চিন্তার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ধারাবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ ঐতিহ্যের অনুশীলন ব্যতিরেকে আধুনিক রাষ্ট্রনীতির ধারাধরন বোধ হয় সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না।

রাষ্ট্রনীতির এক ধাপ উপরে ইতিহাসের স্থান। এবং মূল্যও তার তদনুপাতে বেশী। অতীত বাদ দিয়ে ইতিহাস হয় না। বস্তুতঃ 'ঐতিহ্য' আর 'ইতিহাস' কথা দুটির মধ্যে অর্থগত মিল ছাড়া শব্দগত মিলও বড় কম নয়। দুইয়ের ব্যুৎপত্তিতে একই অক্ষরসমষ্টির দ্যোতনা বর্তমান। ইতিহাস অতীত ঘটনার

নিরস বিবৃতিমাত্র নয়, তা একটি দর্শন (philosophy), যার ভিত্তিমূলে উপাত্ত (data)-স্বরূপ রয়েছে বিভিন্ন বাস্তব প্রমাণাবলী। অতীত এ সকল প্রমাণের সমৃদ্ধতম আকর। অন্য পক্ষে এক শ্রেণীর মনীষী ইতিহাসকে বলেন বিজ্ঞান, এঁদের চোখে ইতিহাস অতীত জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যে পৌছবার একটি সুষ্ঠু প্রকরণ। এই বিজ্ঞানপাঠে সত্যে উপনীত হবার কতকগুলি স্বীকৃত নিয়মবিধি লাভ করা যায়। যাঁরা মার্ক্সবাদে বিশ্বাস করেন তাঁরা ইতিহাসকে বিজ্ঞান তো বলেনই, আরও কিছু বলেন। তাঁরা ইতিহাসের শিক্ষার ভিতর কর্মের সংকেত খুঁজে পান। এবং সেই সংকেতের মর্ম অনুধাবন করে সমাজের প্রচলিত কাঠামোর রূপান্তরসাধনের চেষ্টা করেন, সম্ভবস্থলে সজ্ঞান ইচ্ছার দ্বারা ওই রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতেও ছাড়েন না। অর্থাৎ মার্ক্সীয় ভাবুকদের নিকট ইতিহাস বিজ্ঞান এবং শিল্প, theory এবং practice দুইই। ইতিহাসের ভিতর যেহেতু অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এক আধারে এসে মিশেছে, সেইহেতু ইতিহাস রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি, সাংবাদিকতা ইত্যাদির চেয়ে অনেক বেশী গ্রাহ্য।

কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে সাহিত্য। সাহিত্যে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এই তিনেরই প্রয়োজন অবিসম্বাদী এবং অপ্রতিরোধ্য। এবং ওই তিনের একটির সঙ্গে অপরের পারম্পর্যও বোধ করি এত নিবিড় আর কোথাও নয়। সাহিত্য বর্তমানকে অবলম্বন করে বিকাশলাভ করে সত্য, কিন্তু তার পিছনে অতীতের পটভূমি না থাকলে সাহিত্যপ্রয়াসে আর সাংবাদিকতায় বিশেষ কোন তফাত থাকে না। পিছনে ঐতিহ্য বা অতীতচেতনার পোষকতা না থাকলে সাহিত্যের আস্বাদ গভীর হয় না। কেন হয় না তার একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে অতীতে যে সকল সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তা কালক্রমে আমাদের মনোজীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। যথার্থ সাহিত্যস্রষ্টার সত্তার গভীরে অতীতের সদা-সঞ্চরণ। ক্লাসিক সাহিত্যের মর্যাদায় যে সকল গ্রন্থ আজ অভিষিক্ত সে সকল গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে সবিশেষ আদৃত হয়েছিল এমন নাও হতে পারে। বরং যতদিন গেছে ততই তাদের আদর বেড়েছে এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত। উৎকৃষ্টের উৎকর্ষ কালের অগ্রগতির সঙ্গে খর্ব না হয়ে বরং বৃদ্ধি পায়—এই সাহিত্যের অভিজ্ঞতা। পুরাতন কবির কাব্যের উপর কালের প্রলেপ যত বেশী ঘন হয়ে পড়ছে তত

তার স্বাদগন্ধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কবির রচিত এক-একটি বহুলপরিচিত পর্ব বা চরণ বা শব্দ আকারে-প্রকারে যতই পুরাতনগন্ধী হোক, কালের সুধা তার উপর ঝরে ঝরে পড়ে তাকে এমনই মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে যে তার অতি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাটিও তখন জাতির হৃদ্‌গত হয়ে যায়। কবি জয়দেবের সংস্কৃত কান্তকোমল পদ, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের একাধিক পরিচিত চরণ কালের প্রসাদপুষ্ট এইরূপ কতকগুলি নজির, যা আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণে সহায়তা করে বলে মনে করি। চণ্ডীদাস যখন গেয়ে ওঠেন "সই, সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল। অমৃত সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥" তখন ওই চরণদ্বয়ের অনেকগুলি শব্দের স্বীকৃত অনাধুনিকতা সত্ত্বে তা আমাদের মনের তারে মধুর অনুরণন জাগিয়ে তোলে। 'সই' 'লাগিয়া' 'বাঁধিনু' 'সিনান' 'ভেল'—এ সব কথা পুরনো, অন্যকার সাহিত্যে অব্যবহার্য, এমন কি আজকের দিনের কবিতায়ও তারা গ্রাহ্য নয়, তবু তাদের ধ্বনি এবং অর্থব্যঞ্জনার সৌষ্ঠব কই আমাদের মনের গভীরে এতটুকুও তো ম্লান হয় নি। বরং কথাগুলির মধ্যে ক্রমাগত প্রয়োগে অভ্যস্ত পরিচিত কতকগুলি শব্দের সংস্কার নিহিত থাকায় আমাদের স্মৃতি যেন তাতে আলোড়িত হয়ে ওঠে। বহু ভাব ও শব্দ আছে যা দীর্ঘকালীন পরিচয়ের কল্যাণে জাতির অন্তরস্থ হয়ে গেছে। জাতীয় মানসে বদ্ধমূল একটা সংস্কারের মত তারা জড়িয়ে-মিশিয়ে গেছে। এ সকল শব্দের স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ কোন গুরুত্ব বা তাৎপর্য নেই হয়তো, কিন্তু যথাস্থানে প্রযুক্ত ও বিন্যস্ত হলে তারাই আবার অপরিসীম সৌন্দর্য-মাধুর্যের সৃষ্টি করে। পুরাতন পরিচিত কাব্যের শব্দের ধ্বনি শুধুই একটা ধ্বনিমাত্র নয়, তাতে যেন শত শত বৎসরের স্মৃতির সুরভি মাখানো রয়েছে। কাব্য যত প্রাচীন হয় ততই তার ভাষার ধ্বনিসম্পদ বাড়তে থাকে। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় ভাষা আর ভাষার কাঠামোয় আবদ্ধ থাকে না, শব্দের আক্ষরিক অর্থ ঘুচে গিয়ে তারা কতকগুলি ধ্বনিময় সংস্কারে রূপান্তরিত হয়। উপরের শব্দ-সমূহ এইরূপ কতকগুলি ধ্বনিময় সংস্কার। বৈষ্ণব পদাবলী, কৃত্তিবাস কাশীরাম দাসের বহু পরিচিত চরণ, মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের একাধিক গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বাক্য, নিধুবাবু, দাশরথি রায় ও ঈশ্বর গুপ্তের রচনার টুকরো-টুকরো অংশকে অনুরূপ আরও কতকগুলি দৃষ্টান্ত বলা যায়। এই সব কাব্যসৃষ্টির উপর কালের আস্তরণ পড়ায় তারা আর নিছক কাব্যসৃষ্টির নজির

হয়ে নেই, তারা জাতীয় সংস্কারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। শ্রুতি থেকে তারা স্মৃতিতে সমুত্তীর্ণ হয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে, বর্তমান কালের পটভূমিতে বাস করে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের যিনি চর্চা করতে চান তাঁকে শুধু বর্তমান নিয়ে পড়ে থাকলেই হবে না, তাঁর পক্ষে অতীত কাব্যের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। তা না হলে সত্যকার কাব্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। প্রত্যেক সংসাহিত্যিকের আচরিত রীতি অনুযায়ী তিনি তাঁর রচনায় বর্তমানকে প্রাধান্য দেবেন তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু এই বর্তমান-নিষ্ঠার পিছনে যদি অতীতচেতনার যবনিকা বিলম্বিত না থাকে তবে সৃষ্টির ভিতর আকাঙ্ক্ষিত জোর কিছুতেই আসে না। এ কথার প্রমাণ-স্বরূপে আমরা কবি জীবনানন্দ দাশের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারি। আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে কবি জীবনানন্দ দাশের সৃষ্টির দান অস্বীকার করা যায় না। তিনি বিশুদ্ধ কবিসত্তার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর কল্পনাশক্তিও অতিশয় উচ্চাঙ্গের ছিল। তিনি তাঁর কতকগুলি কবিতায় খাঁটি বাংলা দেশের রূপ নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মননধর্মী কবি হিসাবে তাঁর প্রতিভা কতটা স্বীকৃতি পাবে জানি না, তবে রূপতান্ত্রিক কবি হিসাবে তিনি যে কাব্যামোদী বাঙালীর চিত্তে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সে কথা জোরের সঙ্গেই বলা যায়। কিন্তু এই কবির প্রধান অপূর্ণতা এই যে, আমি যে অতীতচেতনার কথা বলেছি সেই অতীতচেতনা এঁর কাব্যে অতিশয় দুর্বল। জীবনানন্দ দাশ ভাষা ও আঙ্গিকের প্রয়োগে পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলারীতি যেরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করেছেন, আমাদের দেশীয় কাব্যরীতি তার একাংশ যত্ন নিয়েও অনুশীলন করেন নি। তাঁর ছন্দ ভাষা বাক্যগঠনরীতি ইডিয়ম ইত্যাদি পূরো মাত্রায় বিদেশী রচনারীতির দ্যোতক। জীবনানন্দের কবিতা পড়লে মনে হয় না তিনি এ-দেশীয় কাব্যের ঐতিহ্যকে আত্মগত করবার জন্য সামান্যতম শ্রমও স্বীকার করেছেন। তাঁর মানসিক গঠনের গোটা ঝোঁকটাই ছিল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের উপর। এমন কি অব্যবহিত পূর্ববর্তী রবীন্দ্রকাব্যের ঐতিহ্যও যে তাঁর কবিতার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তারও তেমন প্রমাণ নেই। আজকাল এক ধরনের সমালোচক দেখা দিয়েছেন যাঁরা পূর্ববর্তী প্রভাব অতিক্রম করাটাকেই লেখকের স্বাতন্ত্র্যের সব চেয়ে বড় নিশানা মনে করেন। কিন্তু তাঁদের জেনে রাখা ভাল, প্রভাব অতিক্রমণের জন্য যত না ক্ষমতার প্রয়োজন হয় তার চেয়ে বেশী

ক্ষমতার প্রয়োজন হয় প্রভাব আত্মস্থকরণের চেষ্টায়। প্রভাব অতিক্রমণের চেষ্টা এক ধরনের বিদ্রোহ, যার আবেগটুকু নঙর্থক ; পক্ষান্তরে বিধিমতে কিছু আয়ত্ত করতে ধৈর্য ও যত্নের প্রয়োজন, যা সর্বাংশেই অস্তিবাচক। জীবনানন্দ দাশের কবিতার মূল ত্রুটি তার দুর্বোধ্যতা বা অস্পষ্টতা নয়, মূল ত্রুটি তার কবিতায় ঐতিহ্যচেতনার অভাব। বাংলা দেশের প্রচলিত কাব্যের সংস্কারের সঙ্গে তাঁর রচনার বিশেষ যোগ নেই। কবিতার শব্দব্যবহারে প্রকাশরীতিতে চিন্তার প্রণালীতে তিনি বিনিঃশেষে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কাব্যাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। এবং সেইটিই প্রধান হেতু যার জন্য জীবনানন্দ দাশ অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বে বাংলা দেশের পাঠক-সাধারণের নিকট আংশিক খণ্ডিত হয়ে রয়েছেন। বুদ্ধিজীবীদের নিকট তাঁর কাব্যের যতটা আবেদন, ঠিক ততটাই তিনি জনমনের দ্বারা অগ্রাহ্য। বাংলা দেশের জনমনের কাব্যানুভূতি নেই এমন কথা আমরা মানি না, তবে এই হতে পারে যে, পাশ্চাত্ত্য কাব্যের সংস্কারের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকাশ্রিত বাংলা কবিতার রসগ্রহণে তাঁরা অপারগ। কিন্তু এই অসামর্থ্যের জন্য জনমন যত না দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী আধুনিক কাব্যপরিবেশকের দল। ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় স্থাপন না করে কাব্যপরিবেশন করতে গিয়ে এঁরা সহজ কাব্যামোদী জনসাধারণের প্রতি নিতান্ত অবিচার করেন। পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলার সঙ্গে পরিচিত না হলে আধুনিক বাংলা কবিতা বোঝা যাবে না, এই যদি কাব্যপাঠের অপরিহার্য প্রাথমিক শর্ত হয় তা হলে পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলার উপর নিতান্ত অনুচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আমাদের আধুনিক কবিকুলের মধ্যে যাঁরা ঐতিহ্যচেতনার অনুশীলন না করে সজ্ঞানে বৈদেশিক কাব্যাদর্শের দ্বারা অতিরিক্ত মাত্রায় নিজেদের প্রভাবান্বিত হতে দেন, তাঁরা সব পাশ্চাত্ত্য ভাবের ঘরে লালিত আদরের দুলাল। এই আত্যন্তিক পাশ্চাত্ত্যপ্রীতির পশ্চাতে এক ধরনের আহ্লাদেপনা লুকিয়ে রয়েছে, যা পর্যবেক্ষণতৎপর জাতীয় সাহিত্যপ্রেমীর চক্ষে বিসদৃশ না ঠেকে পারে না। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যজ্ঞানের অভাব যদি শিক্ষার অপূর্ণতা বলে বিবেচিত হয়, সে ক্ষেত্রে জাতীয় ঐতিহ্যজ্ঞানের অভাবই বা কেন শিক্ষার অপূর্ণতা বলে গণ্য হবে না তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। বরং জাতীয় ঐতিহ্যজ্ঞানের অভাব পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অজ্ঞানতার তুলনায় বৃহত্তর অশিক্ষারূপে পরিগণিত হওয়া উচিত—সহজ বুদ্ধিতে এই তো আমরা বুঝি। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত,

অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রভৃতির কাব্যে পাশ্চাত্যপ্রেম যে পরিমাণে প্রকট, স্বদেশীয় কাব্যসংস্কার-প্রীতি ঠিক ততটা পরিমাণেই অনুপস্থিত। এই কারণে তাঁরা সব গোষ্ঠীবিশেষের আদুরে কবি হয়েই থাকবেন, সহজ কাব্যবোধযুক্ত জনমনের স্বীকৃতি তাঁদের ভাগ্যে কদাপি ঘটবার নয়।

যদি বলেন, পুরাতন সাহিত্যের সংস্কার প্রদর্শিত যুক্তি অনুযায়ী যখন জাতীয় স্মৃতিরূপে সকলেরই মনে অল্পবিস্তর সক্রিয় রয়েছে তখন আর তাকে অনুশীলনের কী প্রয়োজন। সাধারণের পক্ষে এ কথা প্রযোজ্য হলেও সাহিত্যানুশীলনকারীদের বেলায় তা খাটে না। যাঁরা সাহিত্যসাধনায় নিরত আছেন, সাহিত্যসাধনাকে জীবনসাধনারূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে ঐতিহ্যের চেতনাটাই যথেষ্ট নয়; ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আত্মসাৎ করবার জন্যে তাঁদের হাতেকলমেও চেষ্টিত হওয়া দরকার। যা সংস্কাররূপে তাঁদের মনের গহনে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাকে জাগ্রত বুদ্ধিরূপে মনের উপরের স্তরে উদ্বোধিত করে তোলা তাঁদের একটি পবিত্র দায়িত্ব। আর কোন কারণে যদি নাও হয় স্বীয় শিল্পকর্মের বিশেষ প্রকরণ ও প্রকাশরীতি আয়ত্ত করবার জন্যই বিধিমতে ঐতিহ্যের অনুশীলন সাহিত্যসেবীদের পক্ষে একান্ত করণীয়। ভাষার ইডিয়ম, স্বকীয় বিশেষ প্রকাশরীতি, শব্দে শব্দে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাগত পার্থক্য, ধ্বনির লীলা বুঝতে হলে ঐতিহ্যের গভীরে প্রবেশ করতেই হবে। যাঁরা এ তত্ত্ব জানেন না তাঁরা সাহিত্যের একটি মূল তত্ত্বের সঙ্গেই অপরিচিত বলে আমাদের ধারণা।

কিন্তু ঐতিহ্যের স্বপক্ষে এত কথা বলা হল বলে তার থেকে এ যেন কেউ মনে না করেন যে আমরা স্থিতাবস্থার কিংবা রক্ষণশীলতার পরিপোষক। আমাদের কথা হল এই যে, ভাষার জন্য আমরা ঐতিহ্যের অনুশীলন করব, ভাবের জন্য সমসাময়িক জীবনের দ্বারস্থ হব। সমসাময়িক জীবনের চেতনাকে বাদ দিয়ে সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। সাময়িকতা প্রাণবান সাহিত্যের এক প্রধান লক্ষণ। সমসাময়িক জীবনের আবহাওয়ায় বহু জীবন্ত ভাবাদর্শ ভেসে বেড়াচ্ছে, সক্রিয় চেতনার দ্বারা সেই প্রবহমান ভাবাদর্শগুলিকে জীবনের পরিবেশ থেকে সাহিত্যের পরিবেশের ভিতর নামিয়ে আনতে হয়। পরিবেশের চেতনা, আবেষ্টনীর চেতনা সাহিত্যকর্মীর পক্ষে অত্যাবশ্যক একটি জ্ঞান।

যাকে আমরা বাস্তববোধ বলি সেই বোধ এই চেতনা থেকেই আসে। বাস্তববুদ্ধি প্রাণধর্মী সাহিত্যের একেবারে মূলে গ্রথিত। স্বাদবদলের ক্ষেত্র হিসাবে আমরা হয়তো বাস্তববুদ্ধির দায়-দায়িত্ব থেকে বিদায় নিয়ে রূপকথার রাজ্যে আশ্রয় নিতে পারি, আশ্রয় নিতে পারি অব্যাহতিবাদের পরিপোষক বর্তমানবিমুখ রোমাণ্টিসিজমের নিরাপদ বিবরে, কিন্তু সাময়িক ভিত্তিতেই শুধু এই অন্তর্ধান সমর্থন করা চলতে পারে। প্রাণবান সাহিত্যিককে বর্তমানের আকর্ষণে অযুত প্রশ্ন-সংশয়-দ্বিধা-কণ্টকিত সাময়িকতার কোলে বারে বারে ফিরে আসতেই হবে। যুগধর্মের দাবিপূরণ প্রত্যেক দায়িত্বশীল সাহিত্যিকের পবিত্র কর্তব্য।

এ থেকে আর একটি কথা এসে পড়ে তা হচ্ছে এই যে, ঐতিহ্যচেতনার সঙ্গে প্রগতিশীলতার বিশেষ কোন বিরোধ নেই। আমি ভাষার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাদী, ভাবের ক্ষেত্রে আধুনিক ধ্যানধারণার সমর্থক। শুধু তাই নয়, আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলতে চাই, আধুনিক ধ্যানধারণাকে সাহিত্যের মাধ্যমে ফলপ্রদভাবে রূপদান করতে হলে নূতন-পুরাতনের মিশ্রণ অপরিহার্য। নূতনকে নিতে হবে ভাবে, পুরাতনকে ভাষায়। যে সকল আধুনিক লেখক ‘বিপ্লব চাই, বিপ্লব চাই’ বলে প্রায়শ তাল ঠোকেন এবং ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করবার জন্য সীমাহীন উৎসাহ প্রকাশ করে থাকেন তাঁদের জানা ভাল, পুরাতনের অস্ত্রেই পুরাতনকে সব চাইতে বেশী ঘায়েল করা যায়। এঁদের রচনা আন্তরিকতামণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাঠে মারা যায়, তার কারণ ঐতিহ্যের সশ্রদ্ধ অনুশীলনের দ্বারা উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান এবং প্রকাশরীতি আয়ত্ত করতে এঁরা ভুলে গেছেন, তাই এঁদের অতি সদুক্তিও মনের উপর কোন দাগ কাটে না। সেই সব লেখকই যথার্থ প্রগতিশীল লেখক যাঁরা ঐতিহ্যের উৎকৃষ্ট শিক্ষা আত্মস্থ করে সেই শিক্ষাকে প্রগতির সেবায় বিনিয়োগ করেন। আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এ কথার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কবির ব্যক্তিত্বে প্রগতিশীলতা আর ঐতিহ্যনিষ্ঠা, নবীন ও পুরাতনের সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। কিন্তু এখনকার লেখকেরা সব ভুঁইফোঁড় সদ্য-উদ্ভিন্ন সাহিত্যিক। সাহিত্যের ইতিহাসের যে এক বিরাট-বিস্তৃত অধ্যায় ‘পুরাতন’ এই আপাত-মলিন নামের আবরণে সমৃদ্ধ জ্ঞানের আকররূপে অতীতে বিসর্পিত রয়েছে, তার প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধের নিদর্শনও তাঁদের রচনায় পাওয়া যায় না। ফলে তাঁদের রচনায় প্রাণ ভরে না, প্রগতি ও ক্রান্তির অতি গরম গরম কথাও মনে

হয় বাসী, ঠাণ্ডা। এ-জাতীয় প্রগতিবাদী লেখকের লেখায় উৎসাহের আধিক্য থাকা খুবই সম্ভব, কিন্তু শক্তির পরিচয় অল্প, সে কথা স্বীকার করা ভাল।

এর পর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি। এটিও প্রকৃত সাহিত্যসেবীর পক্ষে অর্জিতব্য। আমাদের আজকের সাহিত্যের স্বরূপলক্ষণ কী, কাল তা কোন্ সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করবে, কোন্ পথে আমাদের সাহিত্য বিবর্তিত হচ্ছে, আগামী সাহিত্যের রূপ কী হবে—এ সকল প্রশ্ন প্রত্যেক সাহিত্যকর্মীরই মনে মনে নেড়ে-চেড়ে দেখা উচিত। সাহিত্যিকের ঐতিহ্যচেতনা তাঁর ভবিষ্যদ্দৃষ্টির পথে অন্তরায় হওয়া উচিত নয়। বরং একটি অপরটির পরিপূরক হওয়া উচিত। যাঁর ঐতিহ্যচেতনা যত আন্তরিক ও গভীর, তাঁর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি তত দূর-প্রসারী হওয়া সম্ভব। আমাদের অতীত এবং সদ্য-বিগত সাহিত্যে অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, ভবিষ্যতে তাদের এই প্রাধান্য থাকবে বলে মনে হয় না। যে সামাজিক বিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে তারা সাহিত্যের আসর জুড়ে বসে ছিল, সেই স্বাভাবিক নিয়মেই অনাগত কালে নির্যাতিত শোষিত শ্রেণীর মানুষদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে তাদের সাহিত্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হবে। কৃষক-শ্রমিকশ্রেণীর মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রমবর্ধমান মাত্রায় সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে—এই লক্ষণ অস্পষ্ট নয়। আর-কিছু সত্য হোক আর না হোক, মধ্যবিত্ত মানসিকতার অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী বলেই মনে হয়। সুতরাং সম্ভাবনাটিকে স্বীকার করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কালধর্মে যার বিনাশ অবধারিত, তার জন্য বিলাপ না করে সাহসের সঙ্গে নূতনকে স্বীকার এবং নূতনের জন্য প্রস্তুত হতে পারাটাই যথার্থ সংস্কৃতিবত্তার লক্ষণ। পুরাতনের পাঠ অনধীত থাকা যেমন বিচ্যুতি, তেমনি অলঙ্ঘনীয় নবীনকে মানতে না পারাও কম বিচ্যুতি নয়। এই কথাটি মনে রাখলে সাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেরই মঙ্গল।

শিল্পীর ব্যক্তিত্ব

কবি-সাহিত্যিক, গায়ক-নর্তক, চিত্রকর-ভাস্কর প্রভৃতি ললিতকলা-শিল্পীদের জীবন সমাজের আর দশজন সাধারণ মানুষের জীবনের অনুরূপ হয় না, এটি আশা করি অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। গড়পরতা মানুষের থেকে আলাদা করে দেখা চলে এমন কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য শিল্পীর জীবনে থাকবেই। হয় সে বৈশিষ্ট্য মহত্তর ও সুন্দরতর জীবনপ্রণালীর ভিতর রূপ পায়, নয় তো বাঁধভাঙা খ্যাপামি, উচ্ছৃঙ্খলতা, নূতনত্বপ্রীতি, ছিট কিংবা বাতিকের আকার পরিগ্রহ করে। কোনও এক ব্যক্তি সুকুমার কলার নিষ্ঠাবান অনুশীলনকারী অথচ জীবনযাত্রায় বৈশিষ্ট্যবর্জিত—এমন দৃষ্টান্ত সচরাচর চোখে পড়ে না। যদিও বা চোখে পড়ে, বুঝতে হবে তেমন মানুষের বাইরেটাই শুধু গতানুগতিকতার পালিশ দিয়ে ঢাকা, তার ভিতরকার চেহারা অন্যরকম।

কেন এমন হয়? কেন শিল্পীরা সাধারণ জীবনযাত্রার ছন্দের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলতে পারেন না? হয় তাঁরা এগিয়ে যান, নয় পেছিয়ে থাকেন—কেন এই অসঙ্গতি?

কেউ বলবেন শিল্পীর আত্যন্তিক অহংবোধই এইজন্য দায়ী। শিল্পী-মাত্রেই অহংবোধ এত প্রবল যে, অন্য দশজনের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি। তিনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না যে তিনি সমাজের সাধারণ দশজনার একজন। অন্য সবাকার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন-বিশ্লিষ্ট করে দূরে সরে গিয়ে তিনি এক ধরনের মানসিক তৃপ্তি পান, যা আর কোনও উপায়েই চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নয়। আর এই অহংবোধের জন্যই শিল্পী সচরাচর বৈচিত্র্যপ্রয়াসী হন, গড্ডলিকাবাহী সাধারণ মানুষ যেখানে গতানুগতিক জীবনের রুটিন নিয়ে তৃপ্ত সেখানে তিনি নিত্য নব নব বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়ান এবং স্বীয় চিন্তা, কর্ম ও আচরণকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করতে পেরে খুশী হন।

কথাটা ঠিক। শিল্পীদের মধ্যে অহংবোধ খুব প্রবল। জ্ঞানীরা বলেন, মানুষের জীবনবিকাশের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল অহংবুদ্ধি; অহংবুদ্ধি বিনিঃশেষে লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যথার্থ ঈশ্বর-উপলব্ধি হয় না। কিন্তু ভগবৎসাধনার ক্ষেত্রে এ কথা সত্য হলেও শিল্পসাধনার বেলায় সত্য কি না

তাতে সন্দেহ আছে। শিল্পীর ভিতর অহংবোধ না থাকলে সৃষ্টিই বোধ করি সম্ভব হত না। শিল্পী কেন শিল্পসৃষ্টিতে প্রণোদিত হন? সে কি এইজন্যই নয় যে তিনি সমাজের অন্য সকলকে ডেকে জানাতে চান, দেখ, তোমরা যা ভাব না কর না, আমি তাই ভাবি করি; সমাজকে আমার কিছু দেবার আছে, আমি তা সমাজকে ধরে দিতে চাই, এবং আমার এই ক্ষমতা নিজে জেনে পরকে জানিয়ে আনন্দও পেতে চাই? শিল্পসাধনা অবশ্য ভগবৎ-সাধনার মত আত্মোপলব্ধিরই সাধনা, তবে এই দুই সাধনার ধারার মধ্যে মূলগত পার্থক্য এই যে, প্রথমটিতে সাফল্যলাভ করতে হলে অহংবোধ সম্পূর্ণ লোপ করে দিতে হয়; আর দ্বিতীয় সাধনার ভিত্তিই হচ্ছে অহং এবং সে-অহং শিল্পসাধনার চরমতম বিকাশের অধ্যায়েও শিল্পীকে পুরাপুরি পরিহার করে না।

শিল্পীর ব্যক্তিত্বের এই গেল একদিক। অন্যদিকও আছে। চিন্তা কল্পনা ভাবের জগৎ নিয়ে শিল্পীর কারবার। তিনি মুখ্যতঃ মনোনিবদ্ধ জীব এবং সে মন সৃষ্টিপ্রেরণায় সততচঞ্চল। এবং যেহেতু তিনি সমাজকে সুন্দর, মহৎ আর নূতন কিছু উপহার দিতে চান, সেইহেতু তাঁর চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে অভিনবত্ব না থেকেই পারে না। তিনি যদি গড্ডলিকাবাহী সাধারণ দশজন মানুষের মামুলি চিন্তাধারাতেই অভ্যস্ত হবেন, তবে তিনি আদৌ শিল্পরচনায় প্রণোদিত হবেন কেন? তাঁর চিন্তা কল্পনা ভাবের অভিনবত্ব তাঁকে সৃজন-কুশলী করে তোলে; শিল্পসৃষ্টির অভিমুখে টেনে নিয়ে যায়।

এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে, অভিনবত্ব শিল্পিজীবনের এক প্রধান লক্ষণ। শিল্পীকে জানতে হলে বুঝতে হলে তাঁর অভিনবত্বের সন্ধান নিতে হবে, কেন না এই অভিনবত্বের তারতম্যেই শিল্পী-প্রতিভারও তারতম্য। একজন শিল্পী বড় কিংবা মাঝারি কিংবা সাধারণ কোন্ পর্যায়ের জানতে হলে প্রথমে সন্ধান করা দরকার তাঁর মন কতটা বৈচিত্র্যপ্রয়াসী। বৈচিত্র্যের দ্বারা তিনি তাঁর শিল্পকর্মকে কতদূর ও কী পরিমাণ মণ্ডিত করতে পেরেছেন তাই দিয়ে সেটির উৎকর্ষের পরিমাপ হওয়া উচিত।

এ থেকে বুঝতে পারা যাবে শিল্পী মানুষ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোথায় পার্থক্য। যে মন সব জিনিসে নিত্য নব নব রসের সন্ধান করে বেড়ায়, নব নব চিন্তা ও কল্পনার উদ্ভাবনে যার পরম স্ফূর্তি, তার জীবনের ধারাও যে একটু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে তাতে আর সন্দেহ কি? ভাবজীবনে নিত্য নূতন ভাব-

কল্পনায় পশ্চাদ্ধাবন করব, অথচ দৈনন্দিন জীবনে মামুলি জীবনযাত্রার ছন্দের সঙ্গে যতি মিলিয়ে চলব—এ কখনও হয় না। চিন্তায় যিনি বলিষ্ঠ, কল্পনায় যিনি দুরবগাহ রহস্যের সন্ধানী, তাঁর আচরণে সেই বলিষ্ঠতার সেই রহস্য-মুখীনতার কিছু-না-কিছু ছাপ থাকবেই। শিল্পীর স্বধর্মই শিল্পীকে মামুলিত্বের কবল থেকে রক্ষা করে।

উপরের কথাগুলিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাবের একটু গন্ধ আছে, গন্ধটি কারও কারও কাছে কটু লাগতে পারে। প্রতিবাদীরা বলবেন, সাহিত্যিক শিল্পী কবি চিত্রকর প্রভৃতি কলানুরাগী ব্যক্তিরা অন্য দশজনের মতই সামাজিক জীব ; সুতরাং অন্য দশজনের মত তাঁরাও বিশেষত্ববর্জিত স্বাভাবিক সাধারণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করবেন, এইটিই প্রত্যাশিত। দশজনের থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা হয়ে চলা, নিজের পথে চলা বৈশিষ্ট্যময় হতে পারে, কিন্তু কাজটি সামাজিকতার বিরোধী। এর মধ্যে এমন একটা ভাব আছে, যাতে করে উচ্ছৃঙ্খলতা আর দায়িত্বহীনতা প্রশ্রয় পায়। এই উচ্ছৃঙ্খলতা আর দায়িত্বহীনতাকে কোন বিবেকী মানুষই অনুমোদন করতে পারেন না। শিল্পীদের এই-জাতীয় আত্মসুখ-সন্ধানী আত্মতৎপর মনোভাবেরই অপর নাম এবং শৈল্পিক পরিভাষা হল বোহেমীয় মনোভাব। মনোভাবটি সমর্থন করা যায় না।

প্রতিবাদীদের কথাগুলি যুক্তিপূর্ণ, অস্বীকার করব না। দশজনের যা করণীয় আমার তা করণীয় নয় ; আমার জাত আলাদা সুতরাং পথও আলাদা —শিল্পীর এই-যে মনোভাব, এর পিছনে এক ধরনের দায়িত্ব এড়ানোর ইচ্ছা লুক্কায়িত রয়েছে বইকি। উচ্ছৃঙ্খলতাকে 'র‍্যাশনালাইজ' অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা সমর্থন করার প্রবৃত্তি থেকেই যে শিল্পীর স্বকীয়তা-প্রীতি জন্মায় নি তা কে বলবে? কিন্তু কথা তা নয়। কী হওয়া উচিত এবং সচরাচর কী হয় এর মধ্যে যোজনব্যাপী পার্থক্য। অনেক জিনিসই হলে ভাল হয়, কিন্তু হয় না। শিল্পীরা শিল্পী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি সামাজিক মানুষের সর্ববিধ দায়িত্ব মেনে চলতেন, সামাজিক মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার খাতে নিজেদের জীবনের ধারা বইয়ে দিতে পারতেন, তা হলে খুব ভাল হত। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই, অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর শিল্পীই বাঁধাধরা পথে চলতে অভ্যস্ত নন। তাঁদের কারও জীবন উদ্দাম, কারও বেহিসাবী, কারও বাতিক-গ্রস্ত। কেউ দুর্দান্ত সাহসী, কেউ বা অতিমাত্রায় ভয়কাতুরে ; কেউ গল্পপটু

মজলিসী, রসনায় সর্বদা রসরসিকতার স্রোত বইছে ; আবার কেউ নিতান্ত মুখচোরা, গো-বেচারা—সাত চড়েও মুখে রা বেরোয় না। কেউ অত্যন্ত বিবেকবান, নীতিনিষ্ঠ, ধর্মপথাবলম্বী ; কারও জীবনে ওই ধর্মবোধ বস্তুটিরই সবচাইতে অভাব।

এ সব স্বভাবের তারতম্যের দৃষ্টান্ত। কতকগুলি সাধারণ লক্ষণও আছে। যথা, শিল্পীমাত্রেই অল্পবিস্তর আত্মসচেতন, লাজুক (লাজুকতা আত্মসচেতনতারই নামান্তর), আত্মপরায়ণ, এমন কি আত্মসর্বস্ব। শিল্পীরা স্বাধীনতাপ্রিয়, স্বাধীনচেতা ও স্বাতন্ত্র্যবাদী এবং যেখানেই স্বাতন্ত্র্য, সেখানেই আত্মমর্যাদা সম্পর্কে অতিরিক্ত আর অশোভন খুঁতখুঁতেপনা। সমাজের সাধারণ দশজনের সপ্রশংস অনুমোদন ছাড়া শিল্পী বাঁচতে পারেন না, অথচ প্রায়ই দেখা যায় সাধারণের দোষত্রুটী দুর্বলতা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে শিল্পীর ভারী স্ফূর্তি। সাধারণকে তিনি ভালবাসেন কিন্তু ভালবেসেও তাদের আমলের মধ্যে আনেন না এমনি তাঁর অহংকার। সাধারণ দশজন হল শিল্পীর অহংকারের শিকার—ইন্ধন না হলে যেমন আগুন চড়ে না, তেমনি সাধারণ মানুষকে হাতের মুঠোয় না পেলে শিল্পীর দম্ভ স্ফূর্তি পায় না। শিল্পীর আত্মবোধ চরিতার্থ হওয়ার জন্য কোনও না কোনও আকারে স্তাবকের দল তাঁর চাই। শিল্পী-জগন্নাথ জনসাধারণের বুকের উপর দিয়ে তাঁর রথ চালিয়ে যেতে ভালবাসেন—সাধারণের বুক গুঁড়িয়ে যাক কি থেঁতলাক তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই।

শিল্পিজীবনের যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হল সেগুলি সাধারণ মাপের বৈশিষ্ট্য নয়, বলা বাহুল্য। এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে, অভ্যস্ত সামাজিক আইন-কানুনের পটভূমিকায় সেগুলি যে এক ধরনের গুরুতর ত্রুটী তা-ও অস্বীকার করা চলে না। সাধারণ দশজন থেকে শিল্পীর জাত আলাদা—এ ধারণা ("The artist must be unhuman, extra-human ; he must stand in a queer aloof relationship to our humanity ; only so is he in a position, I ought to say only so would he be tempted, to represent it, to present it, to portray it to good effect"—Thomas Mann, "Tonio Kroger", *Stories of Three Decades*) শুধু এ যুগেরই একচেটিয়া নয়, সকল যুগেই তা ছিল। বরং বর্তমানের তুলনায় পুরাতন কালেই এ ধারণা সমধিক প্রবল ছিল বলে মনে হয়। প্লেটোর পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে কবি, নাট্যকার ও

শিল্পীর স্থান ছিল না। শিল্পীদের শুধু এই শর্তেই সেখানে জায়গা দেবার সুপারিশ করা হয়েছিল যে, তাঁদের আচরণে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাবে না; রাষ্ট্রপালকেরা যখন যা বিধান দেবেন তাঁরা ভাল ছেলেটির মত বিনা প্রতিবাদে তা মেনে চলবেন। প্লেটো শিল্পী জাতটার উপর নিষ্করুণ ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, শিল্পীরা স্ব-বশ নন; তাঁরা প্রেরণার দ্বারা চালিত সুতরাং পরাধীন; তাঁদের আচরণে যুক্তি কিংবা স্বাভাবিকত্ব (যা শুধু যুক্তিনিষ্ঠা থেকেই আসা সম্ভব) আশা করা যায় না। শিল্পিশ্রেষ্ঠ শেক্সপীয়ার স্বয়ং কবি, প্রেমিক ও পাগলকে এক পর্যায়ভুক্ত করেছেন। মান লিখেছেন, "Every artist is as bohemian as the deuce, inside!" শিল্পীর হাতেই যখন শিল্পীর এই লাঞ্ছনা, তখন অন্যে পরে কা কথা।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে অল্পবিস্তর সকল দেশেই এই ধারণা বলবৎ ছিল যে, শিল্পী মানুষ একটি কিম্ভূত জীব; সাধারণের মানদণ্ডে তাঁকে বিচার করা চলে না। শিল্পপ্রেরণাকে ভগবানের প্রত্যাদেশের ফলস্বরূপ কল্পনা করার অভ্যাস (কবি বাল্মীকি, কবি কালিদাস প্রমুখের কাহিনী স্মরণীয়) এই ধারণা থেকেই মূলতঃ এসেছিল।

এর কারণ নির্ণয় করা কঠিন নয়। সভ্যতার ইতিহাসে যতই আমরা পিছনের দিকে তাকাব ততই দেখব মানুষের জীবনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাবের জয়জয়কার। অবশ্য আদিম কৌম সমাজব্যবস্থার (Tribal society) কথা আলাদা, কেন না সে সমাজে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাবের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক মনোভাবেরই প্রভাব ছিল বেশী। কিন্তু কৃষিসভ্যতার পত্তন হওয়ার পর থেকে মানুষের ইতিহাস ব্যক্তিমহিমায় ক্রমেই অধিক প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই এই সেদিন পর্যন্ত যুগ থেকে যুগে মানুষের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে দেখতে পাই। টয়েনবী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *A Study of History*-তে ব্যক্তিকেই ইতিহাস ও সভ্যতার মূল আধার বলে বর্ণনা করেছেন। ব্যক্তির দ্বারা ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, ব্যক্তিই সমাজ-বিবর্তনের সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়ে সভ্যতাকে বিলয়ের হাত থেকে রক্ষা করে (গীতার শ্লোক স্মরণ করুন—'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত' ইত্যাদি)।

বামপন্থী ঐতিহাসিক ও চিন্তানায়কেরা টয়েনবীর উপরি-উক্ত বিশ্লেষণকে মার্ক্সীয় বিজ্ঞানের আলোকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু তাতে

টয়েনবীর বিশ্লেষণের গুরুত্ব কমে না। ইতিহাসের বিবর্তনের যে ব্যাখ্যা মার্ক্স দিয়েছেন তাতে অনেকখানি সত্য থাকা সম্ভব, তবু এ কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না যে, সভ্যতার বিকাশসাধনে ব্যক্তির দানও বড় কম গভীর ও দূরপ্রসারী নয়। একজন গৌতমবুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, সক্রেটিশ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস, গান্ধী বা লেনিন সভ্যতাকে যে পরিমাণ প্রভাবিত করেছেন, সভ্যতার বিবর্তনে শ্রেণীসংগ্রামের ফল অপেক্ষা তার ফল কোনও অংশেই বোধ হয় ন্যূনতর নয়। ভাব ও কর্মজগতের উপর যেমন উল্লিখিত মহাপুরুষদের গভীর প্রভাব অঙ্কিত, তেমনি শিল্পজগতে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, হোমার, দান্তে, ভার্জিল, র‍্যাফায়েল, মিকালেঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, বীঠোভেন, মোজার্ট, শেক্সপীয়ার, গ্যেটে, শীলার, শেলী, রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় প্রমুখের প্রভাব। বলতে গেলে এঁরাই হচ্ছেন মনুষ্য সভ্যতার প্রকৃত ধারক ও বাহক। এঁদের কল্পনার দীপশলাকা থেকেই কর্মীরা যুগ থেকে যুগে অগ্নিগর্ভ কর্মপ্রেরণা আহরণ করেছেন।

এই সব শিল্পী ও ভাবুকের দল সমাজের গতি মুখ্যাংশে নিয়ন্ত্রিত করলেও সমাজের প্রচলিত আইন-কানুন এঁদের কখনও ধরে রাখতে পারে নি। যখনই সমাজ এঁদের চেপে রাখতে চেয়েছে, তখনই এঁরা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। সমাজের অভ্যস্ত বিধিনিষেধের বেড়া মাড়িয়ে চলতে এঁদের প্রচণ্ড উৎসাহ। সর্বপ্রকার গতানুগতিক অভ্যাস ও বিশ্বাসের প্রতি এঁদের সীমাহীন অবজ্ঞা। সাধারণ মানুষ যে আচরণের কথা কল্পনাও করতে পারে না, শিল্পী নিজ জীবনে অনায়াসে তা সম্ভব করে তুলেছেন, এমন দৃষ্টান্ত শিল্পেতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়ানো। এমন কি, কখনও কখনও বীভৎস নিষ্ঠুর কাজেও তিনি পশ্চাৎপদ নন। শিল্পী ভ্যান গগ্ যখন তাঁর বারবনিতা প্রণয়িনীর কথায় অক্লেশে নিজের কান কেটে প্রণয়িনীকে উপহার দেন, তখন তাকে নিছক পাগলামি ছাড়া আর কী বলা যায়? গ্যেটে যখন তিয়াত্তর বৎসর বয়সে একটি ষোড়শী কিশোরীর প্রেম লাভের জন্যে ক্ষেপে ওঠেন, তার কী ব্যাখ্যা? ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই একটা আছে। শিল্পীর খ্যাপামি আর পাগলামির মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। একই প্রচণ্ড হৃদয়াবেগের তারতম্যে ও প্রকারভেদে কেউ কবি হয়, কেউ বিবাগী হয়ে সংসার ত্যাগ করে, কেউ পাগল হয়। জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ আর উচ্ছৃঙ্খল কামুকের মধ্যে পার্থক্য বিপুল। কিন্তু পার্থক্যটা

আকারের, প্রকারের নয়। আবার, একই ব্যক্তির পক্ষে উচ্চ শ্রেণীর সাধু-সন্ত হওয়া সম্ভব, কবি হওয়াও সম্ভব। কেউ যে কবি না হয়ে সাধু-সন্ত হন অথবা সাধু-সন্ত না হয়ে কবি হন সে শুধু তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যে—নইলে ধার্মিকতা, দার্শনিকতা আর কবিত্বের উৎস একই। রবীন্দ্রনাথের কথা ধরুন। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, ধর্মসাধক। কবি কিংবা দার্শনিক না হয়ে শুদ্ধমাত্র ধর্মসাধকও তিনি হতে পারতেন—তাঁর পক্ষে একজন বড় দরের সাধু-সন্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব ছিল না। তিনি যে ধর্মসাধনার পথে না গিয়ে (যদিও ধর্ম-চিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান কিছুমাত্র অকিঞ্চিৎকর নয়) শিল্পসাধনার পথে গেছেন সে একটা অ্যাকসিডেণ্ট মাত্র। জ্যোতিষ শাস্ত্রের বচনে যদি আপত্তি না থাকে তা হলে বলব, ওটা জন্ম-লগ্নের একটা চক্রান্ত। আবার রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের উপদেশাবলীর কথা ভাবুন। নিতান্ত সাদামাঠা, আটপৌরে কথা, কিন্তু তার মধ্য থেকে যেন একটি সুগভীর শিল্পী মন থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে। সে যুগের যীশু খৃষ্ট আর এ যুগের গান্ধীর সুভাষিতাবলী তো শিল্প-সুরভিতে আদ্যন্ত সমাকীর্ণ।

উপরে যে সমস্ত কথা বলা হল বর্তমান প্রসঙ্গে তাদের কতকটা অবান্তর মনে হলেও একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে সেগুলি অবান্তর নয়। লেখকের প্রতিপাদ্য হল এই যে, সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে ব্যক্তির দান অসামান্য। সে ব্যক্তি কখনও শিল্পী, কখনও ভাবুক, কখনও সাধক, কখনও মহাকর্মী ; এবং আরও যেটা লক্ষণীয়, এই বিভিন্ন শ্রেণীর মহাপুরুষের মধ্যে কোথায় যেন একটা সুগভীর স্বভাবের ঐক্য রয়েছে। মনে হয় সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করবার জন্য এঁরা নন, ওঁদের অনুসরণ করবার জন্যই সমাজ। অবশ্য সামাজিক পরিবেশের প্রভাব, আবেষ্টনীর প্রভাব আর আর সকলের মত এঁদের উপরও সবিশেষ কার্যকরী হয়েছে—যত বড় ব্যক্তিই হোন পরিপার্শ্বের প্রভাব কারও পক্ষেই অতিক্রম করা সম্ভব নয়—তবে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, পরিণত জীবনে সমাজের সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে এঁদের অধিকাংশই আবদ্ধ থাকেন নি, সমাজ ও সংসারের অভ্যস্ত ভূমিকাকে খণ্ডন ও অতিক্রম করেই এঁদের ব্যক্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে এঁরা স্বভাবের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। অন্য-নিরপেক্ষ স্বকীয়তাই হল এঁদের ব্যক্তিত্বের নিশানা।

আজ অবশ্য সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পর্ব ক্ষুন্ন হয়ে গণতান্ত্রিক পর্বের সূচনা হয়েছে। ব্যক্তিকে পিছনে ফেলে জনতা ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কিন্তু এ যুগেও এমন সব শিল্পী ও ভাবুক জন্মাচ্ছেন, যাঁরা অনন্য, অ-সাধারণ। সমাজের প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে এঁদের বিচার চলে না।

আসল কথা, শিল্পী মাত্রেরই জীবনের মাপকাঠি একটু আলাদা। সাধারণ মানুষের স্বভাব আর শিল্পীর স্বভাব এক মানদণ্ডে পরিমেয় নয়। কথাশিল্পী সমারসেট ম'ম তাঁর *Ten Great Novelists and Their Novels* বইতে বিশ্ব-সাহিত্যের দশজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের নামোল্লেখ করেছেন। ম'মের মতে এই দশজন ঔপন্যাসিক হলেন—টলস্টয়, ব্যলজাক, ফ্লবেয়র, স্তেঁধল, হেনরী ফিল্ডিং, চার্লস্ ডিকেন্স, জেন অস্টেন, এমিলি ব্রঁতে, ডস্টয়েভস্কি ও হার্মান মেলভিল। ম'ম এঁদের রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে এঁদের জীবনেতিহাসও মোটামুটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা থেকে দেখা যায়, একমাত্র জেন অস্টেন ও ব্রঁতেকে বাদ দিলে বাকী আটজনই সাধারণ জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জীবন যাপন করে গেছেন। টলস্টয়ের জীবন-কাহিনী সকলেই জানেন। যৌবনে টলস্টয়ের জীবনের ধারা খুব স্বাভাবিক ছিল না—পঞ্চাশের পর টলস্টয়ের স্বভাবে যে বৈপ্লবিক রূপান্তর দেখা দিল তাও সম্পূর্ণ অনন্যসাধারণ। যে টলস্টয় এককালে ছিলেন উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বে-হিসাবী, তিনি শ্রেষ্ঠ জীবনসাধনার দ্বারা ঋষির পর্যায়ে উন্নীত হলেন—শিল্প ও সাহিত্যকে উদার মানবতার সঙ্গে যুক্ত করে তিনি শিল্পসাধনার এক নূতন পথ উন্মুক্ত করলেন। ব্যলজাক ফ্লবেয়ার স্তেঁধল ফিল্ডিং ডিকেন্স ও ডস্টয়েভস্কির নৈতিক জীবন আশানুরূপ উচ্চ ছিল না। বিশেষ করে ডস্টয়েভস্কির জীবনীকারগণ এই বিশ্ববিশ্রুত লেখকের স্বভাবের অনেক দুর্বলতার কথা বলে গেছেন। এ সকল কাহিনীর সবই অকাট্য সত্য এমন মনে করবার হেতু নেই, তবে যা রটে তার কিছুটা বটে এই যুক্তিতে এ সকল জনশ্রুতির একটা ভিত্তি থাকাই সম্ভব। ম'ম শিল্পীর স্বভাব-বিকৃতির একটি কারণ নির্ণয় করেছেন। দুষ্কৃতিপ্রবণতার সঙ্গে নাকি প্রতিভার নিকট সম্বন্ধ আছে। পুরীষের সারে যেমন ফুলের চারা ভাল জন্মায়, তেমনি পাপের পঙ্ক থেকেই নাকি প্রতিভার উদ্গম!

বলা প্রয়োজন, মমের এই সর্বনাশা মত আমরা সমর্থন করি না। আরও যে কথা জোর করে বলতে চাই তা হচ্ছে, শিল্পীদের দুষ্কৃতি সমর্থন করবার

জন্য আমরা এখানে লেখনী ধারণ করি নি। আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। এ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য হল এই যে, শিল্পী দুষ্কৃতকারীই হোন আর যাই হোন, তাঁকে সাধারণের মানদণ্ডে বিচার করলে সে বিচার প্রায়ই ভুল হবার আশঙ্কা থাকে। শিল্পীরা যে সমাজের অন্য দশজনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলতে পারেন না সেইটে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। শিল্পীর জীবন সুস্থ স্বাভাবিকতায় প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যাপারটি খুবই সুখকর ও শোভন হত। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের অন্য কথা বলে। অভিজ্ঞতাটি বেদনাদায়ক কিন্তু সত্য।

শিল্পী ও জীবনশিল্পী

শিল্পীর অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য কেউ কেউ বলে থাকেন শিল্পী ভগবানের চেয়েও বড়। ভগবান স্রষ্টা, শিল্পীও স্রষ্টা। শিল্পী ভগবানের চেয়ে বড় এই হিসাবে যে, ভগবান তাঁর সৃষ্টির নিয়মের দ্বারা বদ্ধ, শিল্পী নিরঙ্কুশ। শিল্পীর বাধাবন্ধহীন স্বাধীনতাই শিল্পীকে ভগবানের চাইতে বড় করে তুলেছে।

শিল্পীর অনুকূলে এই যুক্তি স্পষ্টতঃই শ্রেণীস্বার্থ-চেতনা থেকে উদ্ভূত। সত্যপ্রচার অপেক্ষা স্বার্থবোধদুষ্ট অর্ধসত্য প্রচার বক্তব্যটির উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। ঈশপের গল্পে আছে, মানুষ সিংহের পিঠের উপর চড়ে আছে—এই ভাস্কর্য-মূর্তি যখন সিংহকে দেখানো হল সিংহ তার উত্তরে বলেছিল, ভাস্কর্য-মূর্তির শিল্পী মানুষ বলেই শিল্পকর্মটিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে ; শিল্পী মানুষ না হয়ে যদি সিংহ হত তো সিংহই মানুষের পিঠের উপর চড়ে থাকত।

সত্যি কথা। সিংহের আত্মপ্রকাশের সুযোগ নেই বলেই তাকে অবদমিত করে রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভগবানও সিংহের সহিত তুলনীয়। ভগবান চতুর্মুখ যদি-বা হন, পঞ্চমুখ কদাচ নন। এদিকে শিল্পীরা নিজের কথা বলতে পঞ্চমুখ। মনে হয়, উপরের যুক্তি যাঁরা সচরাচর প্রদর্শন করেন তাঁরা হয় স্বয়ং শিল্পী, নয় শিল্পিশ্রেণীর তল্পীবাহক।

ভগবানের কথা বলতে পারব না, কেন না তাঁকে চাক্ষুষ করি নি। যাঁদের চাক্ষুষ করেছি তাঁদের ক্ষেত্রে যদি তুলনাটা সীমাবদ্ধ রাখা হয় তা হলে বলব, শিল্পী, ভগবান তো দূরের কথা মানুষের চাইতেও বড় নয়। পক্ষান্তরে, এই সহজাত দোষত্রুটীযুক্ত মানবসমাজের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক কালেই এমন কিছু-সংখ্যক লোক জন্মেছেন যাঁরা শিল্পীর চেয়ে অনেক, অনেক বড়। শিল্পীও অবশ্য মানুষ, তবে তাঁর অহমিকা প্রচণ্ড বলে তিনি প্রায়শঃ মানবসমাজ থেকে নিজেকে কিঞ্চিৎ তফাতে রাখতে চান। কিন্তু যাঁদের কথা বলছি, তাঁরা সব অহংবোধশূন্য মানুষ। অহংবোধের অভাবেই তাঁদের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা। এ-জাতীয় অহংবোধশূন্য মানুষ যুগে যুগে জন্মেছেন বলেই সংসার প্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে গেছে ; নয়তো নিছক শিল্পীর শিল্পকর্মের মাহাত্ম্যের দ্বারা সভ্যতা কতদূর এগোত বলা কঠিন।

আসলে প্রশ্নটা জীবনশিল্পী বনাম শিল্পীর। একদল লোক আছেন যাঁরা রূপে রঙে রেখায় সুরে শিল্পকল্পনা ও শিল্পভাবনাকে দেহায়িত করবার জন্য অধীর; আর-এক দল ওই পথে না গিয়ে জীবনকেই শিল্পের মত ফুটিয়ে তুলতে চান। প্রথমোক্তরা কাগজকলম রঙতুলির সাহায্যে শিল্পরচনা করেন; শেষোক্তদের চোখে জীবনটাই একটা রচনা। অর্থাৎ একদল শিল্পী, আর-এক দল জীবনশিল্পী। এ দুয়ের মধ্যে যদি একটিকে বাছাই করতে বলা হয় তা হলে নিঃসংশয়িতরূপেই আমার পক্ষপাত শেষোক্ত শ্রেণীর উপর গিয়ে পড়বে।

পক্ষপাতের কারণটুকু আরেকটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বলি। মনুষ্যত্বের সাধনায় সাফল্যের শ্রেষ্ঠ নিরিখ হল মনের বিভিন্ন বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন। এই সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্যসাধনের কাজটি যে কত দুরূহ তা যে-কোন মানুষ নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। আমরা যারা সাধারণ মানুষের দলে, তারা দুটি-চারটি মানসিক বৃত্তির ভিতর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাতেই হিমসিম খেয়ে যাই, এক দিক রক্ষা হয় তো আর-এক দিক রক্ষা হয় না; এমতাবস্থায় তাবৎ বৃত্তির মধ্যে সুসমঞ্জস ঐক্যবিধানের দুরূহতা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর সৌভাগ্য এইখানে যে, এই দুরূহকে আয়ত্ত করবার মত শক্তিশালী লোকের অভাব সংসারে হয় নি। গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ বলতে যাঁদের বোঝানো হয়েছে, তাঁরা সব এই শ্রেণীর মানুষ। তাঁরা দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ, ভয় ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর তাড়না তাঁরা জয় করেছেন। মানবসভ্যতারূপ বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ ফল প্রকৃত পক্ষে এঁরাই। এঁদের দ্বারা সংসারের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতি অবশ্য সকলেরই সমবেত চেষ্টার দান, তা বলে এই ক্ষেত্রে একক মানুষের প্রয়াসের সার্থকতা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

শিল্পীরা অতি বড় দরের মানুষ, কিন্তু স্বতঃই তাঁরা প্রথম শ্রেণীর মানুষ নন। একই কালে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী এবং প্রথম শ্রেণীর মানুষ—এ রকম যোগাযোগ বড় একটা ঘটে না। বরং এর উলটো নজিরটাই বেশী সত্য। যে সব গুণের দ্বারা ব্যক্তি সমাজে বরণীয় হয় শিল্পিশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সাধারণতঃ তার অভাব এত বেশী চোখে পড়ে যে, শিল্পীর চাইতে সাধারণ কর্তব্যপালনরত নাগরিককেও এক-এক সময় অধিক শ্রদ্ধেয় বলে মনে হয়। শিল্পীরা সৌন্দর্যের উপাসক, তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে উচ্চ মানবিক মূল্যবোধগুলির প্রতিষ্ঠায় যত্নবান; সুতরাং স্বভাবতঃই আশা করা চলে যে, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনও

এই উচ্চ আদর্শগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু প্রায়ই এ আশা অতৃপ্ত থাকে। শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির মহত্ত্ব কদাচিৎ তাঁদের জীবনচর্যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

শিল্পীর ক্ষেত্রে এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার ঘটবার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, শিল্পসাধনা অত্যন্ত সর্বগ্রাসী সাধনা। এই সাধনায় নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে শিল্পীরা এমন একটা এক-মনস্কতার (obsession) বৃত্তের ভিতর আটকা পড়ে যান যে, তাঁদের চরিত্রের অন্যান্য দিকগুলি প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। শিল্পের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি বড় সন্দেহকাতর দেবী। নিজের অধিকারের পান থেকে চুন খসলেই তাঁর মেজাজ বিগড়ে যাবার দাখিল। তিনি তাঁর অনুগত ভক্তকে সকল প্রকার কলুষ-স্পর্শ থেকে সর্বদা আগলে রাখতে চেষ্টা করেন। ফলে ভক্তটির দশা হয়—কোমল হাতের কুলিশ-কঠোর শাসননিয়ন্ত্রিত স্ত্রৈণ স্বামীর মত। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অন্য সকল প্রকারের সংস্পর্শ এড়াবার চেষ্টায় যাঁদের মনোযোগ বিনিঃশেষে একটি বিষয়ের উপর গিয়ে পড়ে স্পষ্টতঃই তাঁদের চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা চিন্তা করবার আছে। শিল্পসাধনা মূলতঃ সৌন্দর্যসৃষ্টির সাধনা বলে শিল্পীর উপর তার দাবি প্রচণ্ড। শিল্পীকে সে এক মুহূর্তের জন্যও অমনোযোগী হতে দেয় না। সৌন্দর্যের সাধনাও এক প্রকারের পরিপূর্ণতার সাধনা, যদিও তার পরিধি জীবনসাধনা বা জীবনশিল্পরচনার মত এত ব্যাপক নয়। যেখানে পরিপূর্ণতার প্রয়াস, সেখানেই উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা পদে পদে। বিশেষ করে শিল্পীর বেলায় এ জিনিসটি বেশী মাত্রায় ঘটতে দেখা যায়। সত্যিকারের শিল্পী স্বকীয় শিল্পসৃষ্টির পরিপূর্ণ উৎকর্ষ বিধানের নেশায় এমন বিভোর হয়ে থাকেন যে, তাঁর অন্য কোন দিকে মন দেবার অবকাশ থাকে না। ফলে তাঁর মনের গতি স্বতঃই একঝোঁকা হয়। এর নাগপাশ এড়ানো বড় কঠিন, কেন না আসলে এটা অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষারই রূপান্তরিত বেশ মাত্র। ক্রমাগত সংশোধনের বা নিত্য নবতর প্রয়াসের দ্বারা স্বীয় শিল্পসৃষ্টিকে নিখুঁত করবার ইচ্ছার ভিতর এমন একটা ভাবাবেশের আচ্ছন্নতা আছে যে, লৌকিক পরিভাষায় একে প্রায় পাগলামি আখ্যা দেওয়া যায়। যেখানেই পাগলামি, সেখানেই মনের একবস্ত্বাভিমুখী আবিষ্টতা। সুতরাং প্রায়ই শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর মাত্রা-বোধের ক্ষমতা থাকে না। শিল্পীর চিন্তাভাবনার পাল্লা সব সময়

একদিকে অতিরিক্ত মাত্রায় ভারী হয়েই থাকে। শিল্পীরা শিল্পকে জীবনের একমাত্র বাস্তব বলে মনে করেন, তাতেই ঘটে যত বিপত্তি। শিল্পকে জীবনের সর্বপ্রধান আশ্রয় মনে করায় আপত্তি দেখি না, যেমন গ্যেটে করতেন, কিন্তু তাকেই যদি একমাত্র আশ্রয় মনে করা হয় সে ক্ষেত্রে জীবনের অন্যান্য দিক্‌গুলির প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করা হয় বইকি। শিল্পীরা সর্বদা এই অবিচার করে এসেছেন, তাইতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণের প্রয়োজন আছে।

আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা বলেছি। আত্মোন্নতি প্রয়াসের নামে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে মানুষের কত সর্বনাশ করে তা বলে বোঝানো যায় না। শিল্পীদের পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা চোখে পড়ে তার মূল প্রায়শঃ এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার গভীরে নিহিত থাকে। প্রতি-যোগিতার প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভালোর সঙ্গে কিছু-না-কিছু ঈর্ষা-বিদ্বেষের খাদ মিশানো থাকে। তবে শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে এ জিনিস যত প্রবল এমন বোধ করি আর কোথাও নয়। কথাটাকে অবশ্য একটা সাধারণীকৃত সত্যের মর্যাদা দিলে ভুল করা হবে, তবে মোটামুটি ভাবে এ কথা সত্য যে, উঁচুদরের শিল্পীরা প্রায়ই তাঁদের সমসাময়িক সহকর্মীদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে অনুদার। পরমত বা পরভাব-অসহিষ্ণুতা শিল্পিস্বভাবের একটা মজ্জাগত ত্রুটী। সাহিত্যের ইতিহাসে মার্লো, গ্রীন্, ন্যাস প্রভৃতির সম্পর্কে শেক্‌স্‌পীয়রের, শীলার সম্পর্কে গ্যেটের, গর্কি সম্পর্কে ঋষি টলস্টয়ের চিত্তসঙ্কীর্ণতার নজির পাওয়া যায়। আর শুধু ওদেশে কেন, এদেশের শিল্পসাহিত্যের ইতিহাস থেকেও এমনতরো নজির একাধিক খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে করি। শিল্পীদের অন্যান্য ত্রুটীবিচ্যুতির কথা এ ক্ষেত্রে না হয় আর না-ই উল্লেখ করলাম।

এ রকম কেন হয়? হয় এ কারণে যে, শিল্পীরা অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মাদরবিশিষ্ট মানুষ, আর আত্মাদর থেকেই যত প্রকার সংঘর্ষের সূত্রপাত। শিল্পসাধনার একটা মজ্জাগত বিচ্যুতি এই যে, ওতে অহংবোধ বিলুপ্ত না হয়ে বরং ক্রমশঃ আরও তীব্র হয়। অহংবোধ ও আত্মাদরের সম্পর্ক অতি নিবিড়। আর যেখানেই আত্মাদর সেখানেই অবধারিতভাবে ঈর্ষা বিদ্বেষ অসহিষ্ণুতার পোষকতা। শিল্পীর আত্মাদর থেকেই শিল্পীর যত প্রকারের উচ্ছৃঙ্খলতা, অনাচার ও ক্ষুদ্রতার উদ্ভব।

পাছে একতরফা রায়ের দণ্ডে দণ্ডিত হই সে-কারণ উপরের মন্তব্যটিকে শর্তাধীন করবার আবশ্যকতা আছে। শিল্পী যতক্ষণ শিল্পসৃষ্টিতে মগ্ন থাকেন ততক্ষণ তাঁর মধ্যে এমন একটা অহংবিস্মৃত আবেগের ভাব দেখা যায় যা তাঁকে সাময়িক ভাবে সকল প্রকার ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে বিলম্বিত করে। শিল্পীর কাছে তখন এক উচ্চ ভাবজগতের দুয়ার আপনা থেকে খুলে যায়। তবে সকল অনুপ্রাণিত মুহূর্তের আয়ুষ্কালের মত এ অবস্থার আয়ুষ্কালও ক্ষণিক। পরক্ষণেই আবার শিল্পীকে আবেশের ঘোর কাটিয়ে বাস্তব জগতের কঠিনতায় নেমে আসতে হয়। উচ্চ ভাবাবেশজনিত তদ্‌গত বিহ্বল ভাব অধিকক্ষণ আঁকড়ে থাকা সম্ভব নয় বলেই শিল্পীর পক্ষে এই বাধ্যবাধকতার আধিপত্য মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তখন শিল্পী আর সকলের মতই সামাজিক জীব। তবে শিল্পীর থেকে অন্য দশজনের তফাৎ এইখানে যে, সমাজের সাধারণ দশজনের মধ্যে শিল্পিসুলভ আত্মাদর নেই; আর যদি বা থাকে তা শিল্পীদের মত প্রবল নয়। ফলে শিল্পীরা সমাজের মধ্যে বাস করেও প্রায়ই সমাজের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলতে পারেন না। তাঁদের জীবন ও জগৎকে দেখবার ভঙ্গীর ভিতর কোথাও না কোথাও একটা আতিশয্যের ঝোঁক থাকেই। স্বকীয় কর্মের মহিমা সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা এবং অপর দশজনের কর্মের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আপেক্ষিক উদাসীনতা শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে খণ্ডিত করে রেখেছে।

অনেকে শিল্পীর উচ্ছৃঙ্খলতা, উৎকেন্দ্রিকতা প্রভৃতি সমাজ-অসঙ্গত আচরণকে সমর্থন করতে চান এই যুক্তিতে যে, শিল্পীর ক্ষেত্রে সাংসারিক সদাচারের নিয়ম ষোল-আনা প্রযোজ্য নয়। সমাজের আর দশজনের পক্ষে যা মান্য শিল্পীর পক্ষে তা মান্য না হলেও চলে, কেন না শিল্পীর কাজের প্রকৃতি একটু ভিন্ন, সাধারণ পাঁচটি কাজের সঙ্গে তার ধরন মেলে না। শিল্পীর শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য তথা গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাঁর জীবনপ্রণালীকে কিঞ্চিৎ উদার প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখাই উচিত। শিল্পীর খামখেয়াল বাতিক তথা সর্বপ্রকার উৎকেন্দ্রিক আচরণকে স্বীকার না করলে সকল ভুলের কাঁটা ধন্য করে শিল্পী শিল্পের ফুল ফোটাবেন কী করে?

এ যুক্তি মেনে নিতে পারা যায় না। শিল্পকর্মকে অন্য সকল কর্ম থেকে একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখবার ফলেই বোধ করি শিল্পের মাহাত্ম্য সম্পর্কে এই অনুচিত ধারণা, এবং তার থেকে এ-জাতীয় যুক্তির উদ্ভব। শিল্পরচনা যদি

বড় কাজ হয় তো জীবনশিল্প রচনা বড় কাজ নয় কেন। বরং খতিয়ে দেখলে এ দুয়ের ভিতর সব দিক্ দিয়ে জীবনশিল্প রচনাকেই তো প্রধানের মর্যাদা দিতে হয়। উদার মানবপ্রেমের আদর্শকে জীবনরচনার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করে যে ব্যক্তি নিজের জীবনের ভিতর সকল প্রকার সদ্বৃত্তির সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করেন, সত্য কল্যাণ ও সৌন্দর্যকে একটা সুসমঞ্জস ঐক্যের মধ্যে অন্বিত করবার প্রয়াস পান, তিনি কি নিছক শিল্পীর চাইতে বড় মাপের মানুষ নন? এমন মানুষ, যাঁর কাছে এলে মন শান্ত হয়, বল পায়, শ্রদ্ধায় আপনা থেকেই নিজেকে নত করে দিতে ইচ্ছা হয়, যাঁর উদার-প্রসন্ন ক্ষমা ও ভালবাসার আঁচ না চাইতেই গায়ে এসে লাগে, তেমন মানুষের সঙ্গে নিছক শিল্পীর সত্যাই কি কোন তুলনা হয়? জীবনশিল্পীর সাধনা সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতার সাধনা। পক্ষান্তরে শিল্পীর সাধনা নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির সাধনা। এই সৌন্দর্যসৃষ্টির ধ্যানে তদ্গত হতে গিয়ে শিল্পীর জীবনের অনেকগুলি দিক্ অপূর্ণ থেকে যায়। বহু মূল্যবান বস্তু বর্জন করে তবে শিল্পী তাঁর শিল্পিজীবনের পরিপূর্ণতা বিধান করেন।

জীবনশিল্পী অবশ্য শিল্পীর মত কুশলী সৌন্দর্যস্রষ্টা নন,—বিশেষজ্ঞের নিকট অবিশেষজ্ঞ সর্বদাই হার মানতে বাধ্য, তবে সৌন্দর্যের আবেদনে তিনিও সাড়া দিতে এবং জীবনসাধনার ভিতর সৌন্দর্যকে রূপায়িত করে তুলতে জানেন। বস্তুতঃ জগৎ-সংসারের সকল দিক্ নিয়ে জীবনশিল্পীর জীবনরচনার বৃত্ত পূর্ণ। সৌন্দর্যকে যেমন তিনি অবহেলা করেন না, তেমনি মানবকল্যাণ এবং সত্যনিষ্ঠার আদর্শও তাঁর নিকট সমান মান্য। 'যাহা সৌন্দর্য তাহাই সত্য, যাহা সত্য তাহাই সৌন্দর্য' এই মহাজনবাক্য শিল্পরচনার ক্ষেত্রে প্রায়শঃ উচ্চারিত হলেও এবং শিল্পীদের পক্ষে তা পরম সন্তোষ ও সান্ত্বনার কারণ হলেও কথাটির উপর বুঝি ষোল-আনা নির্ভর করা চলে না। সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং সত্যানুসরণ এক জায়গায় এসে মিলে গেলেও দুটি বস্তুকে কখনও সমার্থক বা সমধর্মী মনে করা চলে না। সৌন্দর্যের মত সত্য এবং কল্যাণেরও নিজস্ব বিশেষ ক্ষেত্র আছে, যেখানে তাদের আত্মবিকাশ সব চাইতে বেশী স্ফূর্তি লাভ করে। সৌন্দর্যের এলাকা যেমন শিল্প, তেমনি সত্যের এলাকা হল মানুষের কর্মজীবন। আবার কল্যাণের আদর্শকে আমরা সার্থক করে তুলতে পারব না যতক্ষণ না আমরা শিল্পদৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীকে তার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারব। অর্থাৎ নিছক শিল্পের ভিতর

সত্য এবং কল্যাণের ছবি পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া যাবে না; সত্য এবং কল্যাণকে ভাল করে জানতে-বুঝতে হলে তাদের মুখোমুখি হতে হবে তাদের নিজস্ব বিশেষ ক্ষেত্রে। যদি শিল্পই জীবনের একমাত্র রিয়ালিটি হত তা হলে কর্মজীবন তথা সমাজজীবনের কোন সার্থকতা থাকত না। কিন্তু জগৎ-সংসারের অভিজ্ঞতা এই যে, শিল্পের মত কর্মও একটি অপ্রতিরোধ্য সত্য, সমাজও তা-ই। এই কারণে জীবনচর্চার ভিতর এই তিনের দাবিই এককালীন স্বীকার করবার প্রয়োজন আছে। শুধু কর্ম বা সমাজজীবন নিয়ে পড়ে থাকলে যেমন দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণতা বিহিত হতে পারে না, তেমনি শুধু শিল্পের ভিতর দৃষ্টিক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে রাখলেও অখণ্ড বা সামগ্রিক দৃষ্টি আয়ত্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। কর্ম তথা সমাজকল্যাণের আদর্শের দাবি উপেক্ষা করে শুদ্ধমাত্র শিল্পসাধনা নিয়ে পড়ে থাকলে একদেশদর্শিতার ত্রুটি এড়ানো সম্ভব নয়।

উপরে যে অখণ্ড বা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলা হল জীবনশিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী তা-ই। তাঁর চোখে কোন ভাল জিনিসই অগ্রহণীয় বা বর্জনীয় নয়। কর্ম ও সমাজের দাবি সম্পর্কে যেমন তিনি অচেতন নন, তেমনি শিল্পের দাবি সম্পর্কেও তিনি সমান সজ্ঞান। জীবনশিল্পী তার সর্বত্রগামী দৃষ্টির প্রসাদে কোন কিছুকেই অপাংক্তেয় জ্ঞান করেন না। এমন কি মন্দও তাঁর নিকট গ্রাহ্য, যদি তার থেকে ভালর নির্যাস টেনে বার করা যায়। অশুভকে শুভে রূপান্তরিত করবার কৌশল শিল্পীর মত জীবনশিল্পীরও জানা আছে।

এ কথা খুবই সত্য যে, জীবনশিল্পীর কৃতি কোন সময়েই তেমন অর্থে পূর্ণাঙ্গ নয় যেমন অর্থে একজন শিল্পীর কৃতি পূর্ণাঙ্গ, কর্মীর কৃতি পূর্ণাঙ্গ, সমাজসেবকের কৃতি পূর্ণাঙ্গ। অনেকগুলি দিক্‌কে জীবনসাধনার অঙ্গীভূত করতে গেলে প্রত্যেক দিকেরই কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, এবং যে পরিমাণে ত্যাগ করতে হয় সে পরিমাণে প্রত্যেকটি জিনিসেরই সাধনা ত্রুটীযুক্ত থেকে যেতে বাধ্য। বর্তমান যুগ স্পেশালাইজেশনের যুগ, আজ যে-কোন বিষয়কে ভাল করে আয়ত্ত করতে হলে তার পিছনে জীবনের সবটুকু নিষ্ঠা, উদ্যম ও সময় ব্যয় না করলে চলে না। সেই দিক্ থেকে জীবন-শিল্পীর সাধনায় প্রত্যেক দিকেই কিছু-না-কিছু অপূর্ণতা আছে। তবে তার জন্য আক্ষেপের কারণ নেই। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এইটুকু ত্যাগ স্বীকার না করলে কখনও জীবনশিল্পীর সাধনা সর্বত্রগামী হয়ে উঠতে পারত না। প্রত্যেক বিষয়ে

কিছু কিছু মূল্য তাঁকে ধরে দিতে হয়েছে বলেই তাঁর আচরিত সাধনা এমন মূল্যবান হয়ে উঠতে পেরেছে। স্পেশালিস্টের মত জীবনশিল্পী যদি কোন একটি বিশেষ বিষয়ের সাধনায় আজীবন নিয়োজিত থাকতেন তা হলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এমন অখণ্ডতার লক্ষণমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারত কি না সন্দেহ।

শিল্পী সাহিত্যিক কবি শ্রেণীর মানুষের দ্বারা পৃথিবী নানা ভাবে উপকৃত ও সমৃদ্ধ। সভ্যতার অগ্রগতিতে এঁদের দানের তুলনা হয় না। এক-একটি মহৎ শিল্পসৃষ্টির কল্যাণে দেশ ও জাতি অনেকখানি পরিমাণে এগিয়ে যায়। তা বলে সেই মহৎ শিল্পকর্মের যিনি রচয়িতা তিনি আদর্শ চরিত্র না-ও হতে পারেন। এমনকি লৌকিক অর্থে মন্দ-চরিত্র হওয়াও তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। শিল্পীদের জীবনেতিহাসের ভিতর এ কথার সত্যতার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শিল্পিজীবনের সঙ্গে উৎকেন্দ্রিক জীবনযাপনপ্রণালীর কোথায় যেন একটি দুর্নিরীক্ষ্য সূক্ষ্ম যোগ আছে, যার দরুন শিল্পী গতানুগতিক বন্ধনের মধ্যে অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠে। যা-কিছু অ-গতানুগতিক, অ-সাধারণ, খাপছাড়া, তার প্রতি শিল্পীর আকর্ষণ দুর্নিবার ও সহজাত। সমাজের সাধারণ দশজন মানুষ শৃঙ্খলা ও সংযমপ্রিয়। সাধারণের সেই সংযম-শৃঙ্খলাপ্রীতিকে ব্যঙ্গ করবার জন্যই যেন আরও বিশেষ করে শিল্পী ব্যক্তিগত জীবনে অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতায় মেতে ওঠে। চোখ-ধাঁধানো নতুন একটা কিছু করতে হবে বলেই যেন গতানুগতিকত্বের বিরুদ্ধে শিল্পীর অভিযানের উগ্রতা। অবশ্য এ কথার ব্যতিক্রম নেই তা নয়: এমন শিল্পী আছেন যাঁদের ব্যক্তিজীবন তাঁদের শিল্পিজীবনের মত সমান শ্রদ্ধেয়, তবে ব্যতিক্রম বলেই তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র। ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই, ব্যতিক্রমের দ্বারা কখনও নিয়মের অন্যথা হতে পারে না। বরং ব্যতিক্রম নিয়মকে আরও জোরালো করে বলেই আমরা জানি।

গতানুগতিক রীতিনীতির স্বপক্ষে কোন কথা না বলেও বলা যায়, যা-কিছু অ-গতানুগতিক তা-ই ভাল নয়। অ-গতানুগতিক অনেক সময় অস্বাভাবিকের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে, আর অস্বাভাবিক বস্তু মাত্রই অমান্য। শিল্পীরা গতানুগতিকের বন্ধন অতিক্রম করতে গিয়ে প্রায়ই অনুচিতের বন্ধন-ফাঁস গলায় পরেন। শিল্পের দেবীর পায়ে পূর্ণথালি নৈবেদ্য নিবেদন করতে গিয়ে তাঁরা শিল্পেতর দেবদেবীর বিগ্রহগুলিকে থেঁতলে মাড়িয়ে যান। স্বভাব-ধর্ম অনুযায়ী শিল্পী সৌন্দর্যের উপাসক; এদিকে ব্যক্তি ও পরিবার-জীবনে

শোভন-অশোভনের সীমারেখা তাঁদের দৃষ্টিতে তেমন স্পষ্ট নয়—এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার। শোভা তাঁদের মুগ্ধ করে; শোভনতা সব সময় করে না। প্রত্যেক দেশেই এমন কিছুসংখ্যক ব্যক্তি আছেন, শিল্পী হিসাবে যাঁরা অতি উচ্চ শ্রেণীর; কিন্তু নাগরিক হিসাবে, পিতা (বা মাতা) হিসাবে, প্রতিবেশী হিসাবে এমন কিছু অনুকরণীয়-চরিত্র ব্যক্তি নন। বেশীর ভাগ বড় শিল্পীই শিল্পীর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নাগরিকের কর্তব্য পালন করতে ভুলে যান। সমাজবদ্ধ সংসারে প্রতিবেশী হিসাবে একের প্রতি অপরের যে দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্বপালনে শিল্পী শ্রেণীর মানুষ কতখানি তৎপর তা ভেবে দেখবার বিষয়। স্বকীয় শিল্পকর্মকে নিখুঁত করতে শিল্পীর আয়াসের অন্ত নেই, এদিকে অমনোযোগের অবহেলায় সন্তানেরা যে অযত্নবর্ধিত হচ্ছে বা স্ত্রী মনের ভিতর উপেক্ষার বেদনা চেপে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন সেদিকে দৃষ্টি দেবার মত অবসর বা ধৈর্য 'সুমহান্' শিল্পীর নেই। শিল্পীর তন্ময়তার খ্যাতি আছে, তবে সে তন্ময়তা সম্পূর্ণই তাঁর শিল্পকে নিয়ে; অন্য সব বিষয়ে অধিকাংশ শিল্পী উদাসীন বা অসহিষ্ণু। আজকাল শিল্পীর স্বপক্ষে এই একটা নূতন রব উঠেছে যে, শিল্পীও সমাজবদ্ধ মানুষ, কাজেই শিল্পীর প্রতি সমাজের যে কর্তব্য আছে তা পালনীয়। কিন্তু এটা তো হল দাবির প্রশ্ন। দাবি আদায়ের অধিকার প্রয়োগ করবার আগে কর্তব্য পালন করা চাই। এই কর্তব্যপালনের ক্ষেত্রে শিল্পীর দায়িত্ববোধ কতখানি সুপ্রকট তা অনুসন্ধানের বিষয়।

বলা হবে শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মের দ্বারাই সমাজের প্রতি তাঁর ঋণ পরিশোধ করেন, সুতরাং তাঁর আর অন্যবিধ কর্তব্যপালন করবার প্রয়োজন নেই। এ কথা মেনে নিতে পারা যায় না। যাঁর যাঁর বৃত্তি বা জীবিকার কর্মের সহিত সম্পর্কিত দায়িত্ব ছাড়াও এমন কতকগুলি দায়িত্ব আছে যেগুলি বিশেষ ভাবেই নাগরিক (বা সামাজিক) কর্তব্যের এলাকার অন্তর্ভুক্ত। যে কলাকুশল শিল্পী তাঁর শিল্পচাতুর্যের দ্বারা বহু মানুষের চিত্ত জয় এবং তদ্দারা সমাজের অশেষ হিতসাধন করেন তিনি একই কালে সৎ পিতা বা সৎ প্রতিবেশী হবেন, এমন কোন কথা নেই। সামাজিক এমন কতকগুলি দায়িত্ব আছে যা একান্তভাবে সামাজিক ক্ষেত্রেই পালনীয়। যেমন দুর্গতের দুঃখমোচন, পীড়িতের সেবা, আশ্রিতকে রক্ষা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুজনোচিত আচরণ ইত্যাদি দায়িত্ব কোন মানুষ লঙ্ঘন করতে পারেন না, তা তিনি যত বড় শিল্পীই হোন না

কেন। তেমনি নাগরিক দায়িত্বগুলিও শিল্প-নিরপেক্ষ ভাবেই শিল্পীর পালনীয়। অন্য পাঁচজন বৃত্তিজীবী মানুষ যেমন তাঁদের বৃত্তির ভাবনা পিছনে ফেলে রেখে নিছক নাগরিক হিসাবে কর্তব্য পালন করেন, তেমনি শিল্পীর বেলায়ও ওই একই মানদণ্ড প্রযোজ্য। শিল্পী শিল্পচর্চা করেন বলে অন্য সকলের মাথা ডিঙিয়ে সমাজের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা দাবি করতে পারেন না। এ সংসারে সম্মানজনক প্রত্যেকটি কাজই মহান এবং প্রত্যেক কাজেরই গৌরব আছে। কাজেই শিল্পের অনুকূলে বিশেষ মাহাত্ম্য দাবির যুক্তি ঘাতসহ নয়। কিন্তু শিল্পিশ্রেণীর মানুষদের এমনি আত্মাভিমান যে, একচক্ষু হরিণের মত স্বকীয় বৃত্তির উৎকর্ষ স্বীকার করা ছাড়া তাঁরা আর কোন-কিছুরই মাহাত্ম্য স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। অপরের প্রতি সম্ভ্রমবোধের মাত্রা তাঁদের আরও উন্নত হবার অবকাশ রাখে। ফলে নাগরিক কর্তব্যপালনে তাঁদের ত্রুটী পদে পদে। নাগরিক জীবনের কঠিন কর্তব্যগুলি তো পরের কথা, অনেক সময় অতি প্রাথমিক কর্তব্য পালনেও তাঁদের শৈথিল্য সুপ্রকট। শিল্পের সযত্ন-রচিত আত্মকেন্দ্রিক দুর্গে বাস করে করে শিল্পীর এমন অবস্থা হয়েছে যে, অপরের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার চিন্তা তাঁর মনে মোটে জায়গা পায় না। শিল্পীর মনোভাব অনেকটা এই রকম যে, যেহেতু তাঁর হাতে শিল্পরূপ মহান অস্ত্র বিদ্যমান সেই হেতু শিল্পসাধনার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির শোধন করে নিতে পারবেন এবং সামাজিক স্তরের সুনামচ্যুতিগত সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবেন। শিল্পীর এই প্রত্যাশা কতকাংশে পূরণ না হয় এমন নয়, তবে, বলাই বাহুল্য, সমাজের ঋণ এর দ্বারা শোধ হয় না। সমাজের দাবি পরিতৃপ্ত করতে হলে এর চাইতে আরও অনেক বেশী সচেতন কর্মপ্রয়াস সামাজিক স্তরে করণীয়। কিন্তু শিল্পীর সে সময় নেই, বোধ করি ধৈর্যও নেই। ফলে অধিকাংশ শিল্পীই সামাজিক স্তরে কর্তব্যকর্মে অবহেলা-পরায়ণ অর্ধমনস্ক জীব। শিল্পকে কুর্নিশ জানাতে গিয়ে সমাজ-সংসার প্রায়শঃ শিল্পীর চোখে অবজ্ঞাত, অনাদৃত।

ফরাসী বাস্তববাদী শিল্পীদের প্রসঙ্গ বিচার্য। স্তেঁধল, ফ্লবেয়ার, মোপাঁসাঁ, জোলা প্রমুখ লেখক এবং তাঁদের সমতালে-পা-ফেলে-চলা সমসাময়িক একাধিক বাস্তবাদী চিত্রকর ও ভাস্করের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সামাজিক ও নাগরিক স্তরে এঁদের জীবন প্রায় কোনরূপ বাধাবন্ধনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত নয়। অবশ্য এঁদের মধ্যে স্তেধঁল ফরাসী

কূটনৈতিক বিভাগে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন, তবে তার দ্বারা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের উৎকেন্দ্রিকতার শোধন হয় নি। ফরাসী বাস্তববাদী শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টির প্রাচুর্য ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারা শিল্প-সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন সত্য, তবে দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে তাঁদের জীবন কতটা অনুকরণযোগ্য সে প্রশ্ন সঙ্গত ভাবেই করা চলে। পানালয়ে দিনের একটা মোটা অংশ অতিবাহিত হলে স্বভাবতঃই মানসিক ভারসাম্য স্থির থাকতে পারে না। আর মানসিক ভারসাম্য স্থির না থাকলে সুষ্ঠু ভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনও সম্ভব নয়। নাগরিক দায়িত্ব পালনের পক্ষে অত্যাবশ্যক চিত্তস্থৈর্য উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশে অধিগম্য হয় না। অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের পানালয়বাসী সাহিত্যিকদের রচনা-নৈপুণ্য, উনিশ-শতকীয় ফরাসী বাস্তববাদী শিল্পীদের শিল্পচাতুর্য এবং একালে বাংলা দেশে কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের অপরিমিত প্রাণধর্ম আমাদের মুগ্ধ করতে পারে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব, তাঁদের অধিকাংশেরই জীবন ফাঁক ও ফাঁকিতে ভরা। সমাজ ও জাতির দাবি কতকাংশে অবদমিত রেখে তবে তাঁরা শিল্পনৈপুণ্য আয়ত্ত করেছেন। এরকম একতরফা দৃষ্টান্তে মন ভরে উঠতে চায় না।

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে জীবন ও মানুষ সম্পর্কে এক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী বোঝায়। শিল্প-সাহিত্যের যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হবেন এটা স্বতঃই প্রত্যাশিত। কিন্তু এই প্রত্যাশা পূরণ হয় খুব কম ক্ষেত্রেই। এটি খুবই তাজ্জবের ব্যাপার যে, শিল্প-সাহিত্য নিয়ে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যেই প্রকৃত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব বেশী। বরং সেই তুলনায় অশিল্পী সাধারণ যোগ্য মানুষের মনোভঙ্গীর ভিতর এই বৈশিষ্ট্য অধিক মাত্রায় চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতায়' অমিতের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "কমল-হীরের পাথরটাকে বলে শিক্ষা, তার থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকে বলে কালচার।" এই আলোবিকিরণকারী বস্তুটি শিল্পী শ্রেণীর মানুষের স্বতঃই অধিগত হবে এমন কোন কথা নেই। বরং এ রকম বলাই বোধ করি সমধিক যুক্তিযুক্ত যে, শিক্ষিত হলেই যেমন সংস্কৃতিবান হওয়া যায় না, তেমনি শিল্পী হলেই কেউ সংস্কৃতিবান হয় না। সংস্কৃতি বা রবীন্দ্রনাথ যাকে মনঃপ্রকর্ষ বলেছেন, তার অধিকারী হতে গেলে শিল্পের অতিরিক্ত আরও কিছু অনুশীলন করা চাই। সেটি প্রায়ই শিল্পীর দ্বারা হয় না। এই ক্ষেত্রে স্পষ্টতঃই শিল্পীর উপর জীবনশিল্পীর জিত। কেন না জীবন-

শিল্পীর সাধনার মূল কথাই হল অখণ্ড সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুশীলনের সাধনা। এ সাধনায় সাফল্যের মাত্রা যাঁর যত বেশী তিনি তত সুসম্পূর্ণ মানুষ।

জীবনশিল্পী শিল্পী হতে পারেন, না-ও হতে পারেন। তবে শিল্পী যদি জীবনশিল্পী হন তা হলে সোনায় সোহাগা। শিল্পীর বিশ্বাস ও আদর্শগুলি—যার প্রায় প্রত্যেকটি চমৎকার—জীবনচর্যার ভিতর প্রতিফলিত হলে তার চাইতে সুখের বিষয় আর কী হতে পারে। এ সংসারে বেশির ভাগ গলদ ও বিপত্তির মূল অনুসন্ধান করলে দেখতে পাব, ঘোষণা (profession) ও চর্যার (practice) বিভেদ থেকেই তাদের উদ্ভব। বাক্যমাত্রসার ঘোষণাবাণী প্রচার সহজ কাজ; তাকে কার্যে রূপান্তরিত করাটাই কঠিন। জীবনশিল্পীর বেলায় এই অসুবিধা সবচেয়ে বেশী, কেন না তাঁর সাধনায় চর্যা বড় কথা। জীবনশিল্পী আদর্শের বিঘোষণেই সন্তুষ্ট থাকেন না; স্বকীয় জীবনের কর্মের ভিতর যতক্ষণ না সেই আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর শান্তি অন্তর্হিত। এই মানদণ্ডে আমাদের দেশে আধুনিক কালে জীবিত ও মৃত সকল শিল্পীর জীবনচর্যার ইতিহাস অনুধাবন করলে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে 'জীবনশিল্পী' আখ্যা দেওয়া যায়, আর কেউ বুঝি এই মর্যাদা দাবি করতে পারেন না।

নীতিবাদ ও নেতিবাদ

আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্য বিস্তর। নীতি হিসাবে কতকগুলি উচ্চ আদর্শ চোখের সামনে নিয়ত-উদ্যত রেখে আমরা জীবনপথে চলবার যতই চেষ্টা করি না কেন, আমাদের বাস্তব আচরণ ও ব্যবহার তা থেকে ভিন্নতর হতে বাধ্য। ভিন্নতর ও নিম্নতর। উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার একটা সীমা আছে, এই সীমা পেরোবার চেষ্টা করলেই জীবনের ছন্দ বেচাল হয়ে যায়, জীবন-পরিকল্পনার ভিতর একরোখা ঝোঁক ও প্রবৃত্তি দেখা দিয়ে তার সামঞ্জস্য নষ্ট করে। আদর্শ অবস্থা হল পরিপূর্ণতার অবস্থা এবং আমরা সকলেই জানি যে সব দিক্ দিয়ে ত্রুটিবিহীন পূর্ণ লক্ষ্যে কখনও পৌছনো যায় না। আমাদের লক্ষ্যে ও আচরণে দুস্তর ফারাক আছে এবং তা বরাবরকার মতই থাকবে। তবে কেন আমরা লক্ষ্য নির্দেশ করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করি? সে এই কারণে যে, উচ্চ লক্ষ্য আমাদের চিন্তা ও কাজের ভিতর মহত্ত্বের বেগ সঞ্চারে সহায়তা করে, আমাদের কাজের মান তদ্দ্বারা উন্নীত হয়। উচ্চ আদর্শ বা লক্ষ্য চক্ষুর উপর সততবিলম্বিত রাখবার সুবিধা এই যে, শুধু ওই বিলম্বিতকরণের দ্বারাই আমরা অনেকখানি পথ অতিক্রম করে যেতে পারি। দূরের লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে যে তীর ছোড়ে তার তীর কিছু বিদ্ধ করতে পারুক আর নাই পারুক কাছের লক্ষ্যের মাথা অন্ততঃ ছাড়িয়ে যাবেই।

কিন্তু মুশকিল হয় তখুনি যখন আমরা লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে কতকগুলি অসম্ভব আদর্শকে মানদণ্ড রূপে খাড়া করে বসি। 'অসম্ভব' বলতে এখানে বোঝাচ্ছে এমন আদর্শ যা সর্বসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বে বাস্তব জীবনে আচরণীয় নয়। জীবন তার ভুল ভ্রান্তি দুর্বলতা অসম্পূর্ণতা নিয়ে ওই অবাস্তব আদর্শ থেকে বহু বহু দূরে অবস্থিত। এরূপ অবাস্তব আদর্শকে যিনি নিজ জীবনে বরণ করবার চেষ্টা করেন তিনি স্বীয় জীবনকে তো অশান্তিময় করে তোলেনই, চারিদিকের আবেষ্টনীকেও কতকাংশে বিঘ্নিত করে তোলেন। উৎকট আদর্শবাদী এক কিম্ভূত জীব এবং বলাই বাহুল্য, এ-জাতীয় মানুষের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের কখনও ষোল-আনা মিল হয় না। মিল না হবার ফলে আবহাওয়া ঘুলিয়ে ওঠে, আর ওই ঘোলাটে আবহাওয়ার দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলেই কিছু-না-কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হয়। উৎকট নীতি কিংবা আদর্শের বাতিকওয়ালা মানুষ তাঁর

স্বকপোলকল্পিত আদর্শের মাপকাঠিতে নিজেকেও গড়তে পারেন না, পরকেও গড়তে পারেন না, মাঝ থেকে তাঁর অন্তর্বেদনা আর নৈরাশ্যের পীড়াই সার হয়। ইতোমধ্যে কত কত মানুষ যে তাঁর আত্যন্তিক আদর্শবাদের খোঁচা খেয়ে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দূরে চলে যায়, একদেশদর্শী মনোভাবের বশে তিনি তার সঠিক হদিসও পান না।

মানুষ মানুষের দুই জাতীয় আচরণের দ্বারা সব চাইতে বেশী আহত হয়—আত্মাদর ও পরের প্রতি অসূয়া। উৎকট আদর্শবাদের ভিতর এই দুই ধরনের মনোভাবই লুকিয়ে আছে। সমাজে সংসারে যাঁরা উৎকট নীতিবাগীশরূপে পরিচিত তাঁদের মনোভাব অনেকটা এই রকমের যে, আমি যে আদর্শ ধরে আছি সেইটাই একমাত্র খাঁটি ও ধ্রুব আদর্শ; বাদবাকী মানুষ যে আদর্শ অবলম্বন করে আছে তা নিতান্তই নিম্নস্তরের বস্তু, তাদের আচরণও তেমনি বিপথগামী ও ভ্রান্ত। এই মনোভাব থেকেই যত ভুল-বোঝাবুঝির উদ্ভব, বিসম্বাদ আর বিপত্তির উদ্ভব। উৎকট নীতিবাগীশ মানুষ স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় যে-পরিমাণ আস্থাশীল, পরের প্রতি ঠিক ততটাই তাঁর তাচ্ছিল্য-বোধ। ভাবখানা এই যে, আহা, এরা কী করুণার পাত্র! এরা জানে না এরা কী হারাচ্ছে, কোন্ অধঃপতনের গহ্বরে দিনে দিনে তলিয়ে যাচ্ছে। আমার আদর্শের পথ অনুসরণ করলে এদের এমন দুরবস্থা হত না। মনোভাবটি স্পষ্টতঃই আষ্টেপৃষ্ঠে আত্মপ্রীতিতে অনুলিপ্ত। এই মনোভাবের জন্যই সংসারে মানুষে মানুষে প্রতি পদে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষ কখনও প্রকাশ্য, কখনও তা মনস্তাত্ত্বিক স্তরের সূক্ষ্ম সংঘাত রূপে প্রকাশমান; তবে প্রত্যক্ষই হোক আর পরোক্ষই হোক সংঘর্ষটি যে বিদ্যমান সে বিষয়ে এতটুকু ভুল হওয়ার জো নেই।

উৎকট আদর্শবাদী মানুষ মাত্রই উৎকট আত্মপ্রেমিক। আদর্শবাদকে একটি fetish-এ রূপান্তরিত করে সেই বিগ্রহের পাদমূলে নিয়ত তিনি অন্ধের ন্যায় অর্ঘ্য নিবেদন করেন। সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অনাচরণীয় নীতির ক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে তিনি দণ্ডী ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবনবিমুখ হয়ে আছেন। তাঁর জীবন-বিমুখতার দ্বারা তিনি নিজে নিগৃহীত, অপরে অন্যায় ভাবে সমালোচিত। ত্যাগ-বৈরাগ্যের নামে অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্র সাধনার দ্বারা তিনি স্বীয় জীবনকে বিড়ম্বিত করে তোলেন, অপরের জীবনস্পৃহাকেও লাঞ্ছিত করেন। এককালীন ব্রাহ্ম কট্টর সুনীতিবাদীদের ন্যায় সত্যস্পৃহাকে মর্যাদা দিতে গিয়ে তিনি

সত্যান্থরাগকে বাতিকে পরিণত করে তোলেন, তার ফলে যথার্থ সত্যান্বেষণ-স্পৃহা ধিক্কারে লজ্জায় মুখ লুকোবার পথ খুঁজে পায় না। উৎকট নীতির মোহ শুচিবাইয়ের মত একটি রোগ। এ রোগের খপ্পরে পড়লে আর রক্ষা নেই। দু দিনেই জীবন অশান্তিময় হয়ে ওঠে। শুধু নিজের জীবন নয়, পরিপার্শ্বের অপর দশজনের জীবনও। নীতিবাগীশ কোন ব্যাপারেই আপোস-রফা করতে জানেন না। ছোটখাট প্রশ্নেও তাঁর খুঁতখুঁতেপনার অন্ত নেই। নীতির পান থেকে এতটুকু চুন খসলেই তাঁর মনে হয় গোটা জীবন-মহাভারত-খানা অশুদ্ধ হয়ে গেল। এ রকম নিদারুণ শুচিবাইয়ের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রকৃত নীতি কিংবা সত্যসন্ধানীরা জানেন, এ রকম চুলচেরা নীতির বাইকে প্রশ্রয় দিতে থাকলে তা ঘাড়ে চেপে বসে, শেষ অবধি তা মানুষের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দেয়। নীতি ও সত্যপূর্ণ জীবন অবশ্যই যাপনীয়। তবে কথা হল যে, নীতির নির্দেশগুলিকে বড় বড় ব্যাপারে প্রয়োগ করার দিকেই আমাদের অধিকতর প্রযত্ন থাকা উচিত। জীবনের বৃহদ্ব্যাপারগুলিতে নীতিপ্রয়োগে উদাসীন থেকে কেবলই যদি আমরা ছোটখাট ব্যাপারে নীতিপ্রয়োগের অত্যুৎসাহ দেখাই, অচিরেই জীবন বিষময় হয়ে উঠতে বাধ্য। প্রকৃত জ্ঞানীরা এইজন্য ওই আত্যন্তিক নীতিবাইয়ের পথ সযত্নে পরিহার করে চলেন। তাঁরা জানেন, সংসার-পথে চলতে গেলে, বহু মানুষকে নিয়ে কাজ-কারবার করতে গেলে, সামান্য সামান্য ব্যাপারে মাঝে মাঝে রফা করে চলতে হয়। তাতে নীতির জাত যায় না, বরং তার দ্বারাই নীতি রক্ষা পায়। বৃহৎ বৃহৎ প্রশ্নে নীতিনিষ্ঠা ও আদর্শবাদ অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে আমাদের অভিনিবেশ, সাবধানতা ও উদ্যমের সঞ্চয় পরিমিত ভাবে ব্যয় করা আবশ্যক। একযোগে সকল দিকে অভিযান পরিচালনা করতে গেলে দুদিনেই ফতুর হয়ে আমরা স্বীয় জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনব। সব জিনিসেরই বাড়াবাড়ি খারাপ, রয়ে বসে ধীরে সুস্থে কাজ করলে তবেই কাজের ভিতর ছন্দ রক্ষা করা সম্ভব।

উৎকট নীতিবাদীরা নীতির সঙ্গে সৌন্দর্যকে মেলাতে পারেন না, তাতে তাঁদের জীবনে আরেক ধরনের ট্রাজিডির সৃষ্টি হয়। নীতিবাগীশ মানুষ-মাত্রেই সংসার-জীবননাট্যের এক-একজন ব্যর্থ নায়ক। নীতিবাগীশসুলভ এই ট্রাজিক সত্তাটি আমাদের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বোধ হয় অল্পবিস্তর লুক্কায়িত রয়েছে। আমাদের অধিকাংশেরই জীবন গতানুগতিক নীতিবোধের দ্বারা

চালিত। সৌন্দর্যের একটা নিজস্ব দাবি আছে, সেই দাবির সঙ্গে বাজারচলতি নীতিবুদ্ধির প্রায়শঃ বনিবনা হয় না। আর তা থেকে জীবনে বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। আমরা সাধারণ দশজন এ সকল সমস্যার সমাধানের কোনরূপ উপায় জানি না, ফলে অন্তর্দ্বন্দ্বের আঘাতে-সংঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হওয়াটাই শুধু আমাদের সার হয়। আমাদের মধ্যে যাঁরা একান্তরূপে নীতিনির্ভর, বড় থেকে ছোট সকল ব্যাপারে নীতির নির্দেশ ছাড়া যাঁরা এক পাও অগ্রসর হতে নারাজ, তাঁদের অবস্থাটা আরও অসহনীয়। এমন নয় যে তাঁদের ভিতর সৌন্দর্যের ক্ষুধা নেই, কিন্তু আত্যন্তিক নীতিবুদ্ধির শাসনে সেই সৌন্দর্যের ক্ষুধা নিরন্তর লাঞ্ছিত। এ-জাতীয় লাঞ্ছনায় সৌন্দর্যের ক্ষুধা মরে না, শুধু মনের অবচেতনে প্রবিষ্ট হয়ে আপাতসতর্ক চোখের পাহারাকে ফাঁকি দেয় মাত্র। কিন্তু তাতে কিছু লাভ হয় না। অবদমনের বিকার এক সময়ে না এক সময়ে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করেই। প্রকৃতিকে ফাঁকি দিলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করবার অপরাধের মাশুল সুদে আসলে উসুল করে কুপিতা প্রকৃতি তবে নিরস্ত হন। প্রকৃতিদেবীর এই রোখ আমাদের সকলের উপর রয়েছে, নীতিবাগীশদের উপরই সব চাইতে বেশী। নীতিবাগীশ মানুষ অবধারিত ভাবে একজন অবদমিত মানুষ। সৌন্দর্য ও প্রেমের দাবিকে চেপে রেখে জীবনে সুনীতিবাদের ধ্বজা উড়াতে গিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত সুকঠিন মানসিক আলোড়নের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হন। তিনি সব সময় একটা tension-এর অবস্থায় বাস করেন। খুব আঁট করে বাঁধা ধনুকের ছিলার মধ্যে যেমন প্রচণ্ড গতিবেগ সংহত হয়ে আছে, তেমনি সৌন্দর্য ও নীতির দ্বন্দ্বে পীড়িত মানুষের ভিতর একটা বিপর্যয়-সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তে থরথর করে কাঁপছে। নীতিধ্বজী মানুষ সর্বদা একটা ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে; আকস্মিক বিপর্যয়ের আশঙ্কায় তাঁর মুখের ভাব থমথমে, চলা ও বলা জ্বরতপ্ত রোগীর মত বিকারদোষদুষ্ট। যাঁদের ভিতর নীতিবুদ্ধির বাড়াবাড়ি নেই—তেমন লোকের সংখ্যাই সংসারে বেশী—তাঁরা যেখানে হেসে খেলে আনন্দ করে, ভালবেসে ও ভালবাসা পেয়ে দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, সে স্থলে নীতিবাগীশ অসম্ভব আদর্শবাদের পায়ে গড় করতে গিয়ে তাবৎ সুখে স্বেচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বীয় জীবনকে অযথা অভিশপ্ত করে তুলছেন। নীতিবাদীর অসহায়তা মর্মান্তিক।

নীতি ও সৌন্দর্যের, আদর্শবাদ ও বাস্তবতার বিরোধের নিষ্পত্তির সব

চাইতে ভাল উপায় যাঁদের জানা আছে তাঁরা হলেন শিল্পী শ্রেণীর মানুষ। শিল্পীরা তাঁদের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী তথা নিজস্ব জীবনযাপনের পদ্ধতি ও রীতির দ্বারা এই দ্বন্দ্বের একটা কাজ-চালানো-গোছের সমাধান আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা নীতি ও সৌন্দর্যের পরস্পরবিরোধী দাবির ভিতর একটা আপোস-রফার পথ খুঁজে পেয়েছেন। শিল্পীরা অনীতির পরিপোষক এমন মনে করবার কোনই কারণ নেই। বরং তাঁদের নীতিবুদ্ধি সাধারণ দশজনার তুলনায় অনেক বেশী গভীর ও অন্তরশায়ী। তবু যে তাঁরা পরকীয়া প্রেমের জয়মহিমা কীর্তনে মুখর হন, নারীদেহের অনাবরণ মুক্ত সৌন্দর্যের সুধা দু চোখ ভরে পান করেন, স্থাপত্যে আর ভাস্কর্যে মন্দিরগাত্রে আর গুহায় মিলিত মিথুনের মূর্তি উৎকিরণে সঙ্কোচ বোধ করেন না, সে শুধু শূন্যতার প্রতিকূলে জীবনের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। শিল্পীরা জীবনপ্রীতিতে ভরপুর। পক্ষান্তরে, উৎকট আদর্শ কিংবা নীতিবাদী মানুষ তাঁর জীবন-পরিকল্পনার কেন্দ্রমধ্যে শূন্যতার বিগ্রহকেই সমাসীন করেছেন। নীতিধ্বজী মানুষের কণ্ঠে জীবনের জয়গান ফোটে না। তিনি নেতিবাদের উপাসক সুতরাং আমৃত্যু শুধু মৃত্যুরই ভজনা করে যান। শিল্পীরা জীবনসাধক, সে-কারণ শ্রেষ্ঠ নীতি ও সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটাতে তাঁরাই শুধু সক্ষম। ইংরেজীতে love of life বলে যে একটি কথা আছে তা শুধু তিনটি শব্দের মামুলী সমন্বয় মাত্র নয়, তা একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রতীক। কথাটির তাৎপর্য দূরপ্রসারী। Love of life বা জীবনবাদ প্রকৃতির রঙ-রস-রূপের ছোঁয়া লেগে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। জীবন-উপভোগ জীবনবাদের লক্ষ্য হলেও লালসালাঞ্ছিত স্থূল ভোগের সংস্কারের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। জীবন-উপভোগ বলতে বোঝায় রসিকের ন্যায় জীবনকে তার সকল বৈচিত্র্য আর বৈপরীত্য নিয়ে চেখে চেখে ভোগ করা। তথাকথিত আধ্যাত্মিক সুখ কিংবা ইহবিমুখতার সংস্কার থেকে এ জীবনদর্শন সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত।

শিল্পীরা এ-জাতীয় জীবনদর্শনের বিশেষ অনুগত। এর মধ্যে যে Paganism রয়েছে তা শ্রেণী হিসাবে এঁদের বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। অমিত সৌন্দর্য সুষমা মাধুর্য প্রীতি ও আনন্দ মধুক্ষরা এই জীবনদর্শনের গা থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে। তার মানে এ নয় যে, মৌলিক নীতিবোধগুলিতে সৌন্দর্যবাদীদের আস্থা নেই। মৌলিক নীতিবোধে আস্থা তাঁদের অবিচল, শুধু তাঁদের বেলায় সৌন্দর্য ও নীতি এক আধারে জড়িয়ে-মিশিয়ে গেছে। ছুৎমার্গী নীতির বাতিক-

গ্রন্থদের সঙ্গে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুতর প্রভেদ এইখানে যে, শিল্পী যেখানে প্রেমকে জীবনের কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যগ্র, নীতিবাগীশ সেস্থলে খোদ প্রেমকেই জীবন থেকে বাতিল করতে চান। নীতিবাগীশের নিকট প্রেমের সৌন্দর্যের আনন্দের কোন দাম নেই। পক্ষান্তরে, শিল্পী একান্তভাবে প্রেম ও সৌন্দর্য-নির্ভর। প্রেমের পরিমণ্ডল চতুর্দিকে বিরাজমান না থাকলে শিল্পী নিঃশ্বাস নিতে পারেন না। প্রেমকে এখানে তার বিশুদ্ধ, ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে, তার স্থূল লৌকিক অর্থে নয়। যদি বলেন পরকীয়া প্রেমের আদর্শটি অশুচি, তদুত্তরে বলি, প্রেম যারই উপর ন্যস্ত হোক তা যদি খাঁটি হয় তা কখনও অশুচি হতে পারে না। অশুচি হল প্রেমে আন্তরিকতার অভাব, আবেগের অভাব, মিথ্যাচার ও বিশ্বাসহীনতা। শিল্পীরা যে প্রেমের কথা বলেন তার মধ্যে বিশ্বাসহীনতার স্থান নেই, মিথ্যাচারের স্থান নেই, সে-কারণ তা ধূমলেশহীন দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল ও পবিত্র। নীতিবাগীশ যেহেতু প্রেমকে অস্বাভাবিক মনে করেন, অস্বাস্থ্যকর মনে করেন সেইহেতু তার ভাবনা মূলেই কলঙ্কিত। প্রেমের সঞ্জীবনী শক্তিতে যাঁর বিশ্বাস নেই তিনি জীবনের একটি মৌলিক নীতির বিরুদ্ধাচারী। তথাকথিত অর্থে নীতিবাদী হয়েও তিনি সব চাইতে অনীতির পরিপোষক।

দেখা যায় বিশ্বসাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শ্রেষ্ঠ কবি ও শিল্পী জীবনপ্রীতির উদ্‌গাতা। তথাকথিত নীতিবাদ নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। নীতিবাদ এঁদের নিকট নেতিবাদেরই নামান্তর। যে দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয়ে জীবন সুন্দর হয় স্বাস্থ্যকর হয় কল্যাণপ্রসূ হয়, সেই দৃষ্টিভঙ্গীর মহিমাই এঁদের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মিকালেঞ্জেলো প্রমুখ নবজাগৃতির যুগের ইতালীয় শিল্পিকুল, শেক্‌স্‌পীয়র ও গ্যেটে, এ যুগের আনতোল ফ্রাঁস ও টমাস মান সবাই সৌন্দর্যের সঙ্গে মৌলিক নীতিকে গ্রথিত করে এক বৃহত্তর সত্যের জগতে আমাদের উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। প্রচলিত নীতির মাপকাঠিতে হয়তো এ জগতের ধ্যান ধারণা বিশ্বাস কিছুটা বিসদৃশ ও অসামাজিক মনে হবে, কিন্তু শিল্পবিচারের মানদণ্ডে এর চাইতে স্বাভাবিক ও বাস্তব ভাবাদর্শ আর কিছু হতে পারে না। গ্যেটে সৌন্দর্যনীতি ও লৌকিক নীতির দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষ পর্যন্ত আর্টের সত্যকেই জীবনের মূল উপজীব্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভিতর এ দ্বন্দ্ব তো ছিলই, উপরন্তু ধর্ম এসে তাঁর এই মানসিক দ্বন্দ্বসংঘাতকে

আরও বেশী তীক্ষ্ণতা দান করেছিল। গ্যেটের দ্বন্দ্ব ছিল শিল্প ও নীতির দ্বন্দ্ব ; রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্ব আরও বেশী গভীর এ কারণে যে, তাঁর মানসজীবনের ভিতর শিল্প নীতি ও ধর্ম এই তিন আপাতবিরুদ্ধ প্রবণতার সংঘাত ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরিসীম সমন্বয়ী প্রতিভার বলে এই ত্রিবিধ ভাবকেই এক অখণ্ড সামঞ্জস্যের মধ্যে অন্বিত করেছিলেন। গ্যেটের ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের অধিকতর সম্প্রসারণক্ষমতা ও গ্রহিষ্ণুতা এর দ্বারা প্রমাণ হয়। এ যুগের অন্যতম মহান সাহিত্যিক টমাস মানের সৃষ্ট শিল্পচরিত্রগুলির মধ্যে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। এসকল চরিত্র শিল্প ও সৌন্দর্যচর্চার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধির সাধনায় মগ্ন, অথচ শিল্পব্রতী বলেই যেন এঁদের ভিতর জৈবসাধনার তাড়না আরও প্রবল। আলডুস হাক্সলীর সাম্প্রতিক এক উপন্যাসে একজন বৈজ্ঞানিকের চরিত্র আঁকা হয়েছে, যার ভিতর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যেরূপ প্রবল দেহবাসনাও তদ্রূপ প্রবল। চরিত্রের এ সকল আপাত-অসঙ্গতিগুলি এ কথারই শুধু প্রমাণ করে যে, নীতিবাদের সহজগ্রাহ্য ফরমূলায় কোন মানুষের জীবনকেই বাঁধা যায় না, বাঁধতে গেলে হিতে বিপরীত ফল হয়। নীতিবাদের সারল্যের তুলনায় মনুষ্যজীবন অনেক, অনেক গুণ বেশী জটিল ও বৈচিত্র্যসমন্বিত। মানুষের চরিত্রের ভিতর আলো-আঁধারির লীলার শেষ নেই। বহু বিচিত্র মনন ও আকাঙ্ক্ষা তাতে লুকিয়ে থাকতে পারে, থাকে। ভোগ ও ত্যাগ, প্রেম ও অপ্রেম, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ একই সময়ে মানুষের মনকে আলোড়িত-বিলোড়িত করবার ক্ষমতা রাখে। এই মিশ্র অনুভূতিকে নীতিবাদের জ্যামিতিক সারল্যের ছাঁচে ফেলতে গেলে মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়। নিরবচ্ছিন্ন বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্র সাধনের দর্শন কোন মানবচরিত্রজ্ঞেরই মন হরণ করতে পারে না।

আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা যে গভীর মানবচরিত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন তার একটি প্রমাণ পাই ভারতীয় জ্যোতিষের ভিতর। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র তথাকথিত নীতিবাদের এক প্রচণ্ড প্রতিবাদ। একই গ্রহের প্রভাবাধীনে জাতকের ভিতর কত বিভিন্ন দোষগুণের সমাবেশ ঘটতে পারে জ্যোতিষকারেরা তা নিরূপণ করবার চেষ্টা করেছেন। মানুষের জীবন যে আত্যন্তিক নীতিবাদের সরল রেখায় চলে না, মানবজীবনের উপর গ্রহের বর্ণিত প্রভাব বিচার করলেই তা বুঝতে পারা যায়। যে ব্যক্তি বহুশাস্ত্রজ্ঞ, সৎ ও নীতিশীল, তাঁকেই আবার ভারতীয় জ্যোতিষে সুরতপ্রিয়, প্রমদাসক্ত বলে বর্ণনা করা

হয়েছে। যে ব্যক্তির স্বভাবে হঠকারিতা-দোষ আছে, অহমিকা ও ক্রোধ আছে, তাকেই আবার প্রবল ধর্মানুরাগী বলা হয়েছে। এ থেকে এই শুধু বোঝা যায় যে, মিশ্র ব্যক্তিত্বের তত্ত্বটি জ্যোতিষকারেরা ভাল ভাবেই জানতেন। আর জানতেন বলেই তাঁদের গ্রহসকল অঙ্কশাস্ত্রের বর্ণিত নির্দিষ্ট কক্ষপথ অনুসরণ করে চলে নি, চলেছে আপন আপন খেয়ালের নিয়মে। জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রহের হস্তে মানবস্বভাব যুগপৎ সম্মান ও নিগ্রহ লাভ করেছে।

আমার মনে হয় যাঁরা কথায় কথায় নীতির দোহাই পাড়েন, মানুষের প্রতিটি বাক্য ও আচরণকে চুলচেরা নীতির বিচার দ্বারা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করার চেষ্টা করেন তাঁরা মানবচরিত্র ভাল জানেন না। স্বীয় কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার আদর্শের দ্বারা সমগ্র জগৎ-সংসারকে বিচার করতে গিয়ে তাঁরা গড়পরতা মানুষের উপর অতিরিক্ত দায়-দায়িত্ব আরোপ করেন, যে দায়-দায়িত্ব পালন করা স্বতঃই সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের উপর অতটা ভর চাপানোর চেষ্টার অর্থ নিতান্ত অসম্ভবের প্রত্যাশা করা। তার চাইতে নীতিবাগীশ যদি জগৎ-সংসারের মাপে নিজের চিন্তা ও আচরণকে আরও খানিকটা খাট করে আনেন, তা হলে তাঁর নিজেরও সুসার হয়, পরিপার্শ্বের মানুষগুলির মধ্যেও স্বস্তিবোধের সঞ্চার হয়। উৎকট নীতিবাদীকে নিয়ে মুশকিল এইখানে যে, তিনি সব সময় আপনার কোলের দিকেই সবটুকু ঝোল আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেন, পরের কথা ভাববার আর তাঁর অবকাশ হয় না। তিনি মনে করেন তিনি যখন কঠোর নীতির আদর্শে বিশ্বাসবান তখন আর সকলের পক্ষেও সেই একই রূপ কঠোরতা অবলম্বনীয় এবং যাঁদের আচরণ তাঁর আদর্শের সহিত সঙ্গতিযুক্ত নয় তাঁরাই দূষ্য, পতিত, অন্ত্যজজ্ঞানে বর্জনীয়। এ-জাতীয় আপোসহীন চরম মনোভাব কল্পনাশক্তির অভাবের দ্যোতক। নীতিবাগীশের আরও একটু কল্পনাশক্তি যদি থাকত তা হলে তিনি দেখতে পেতেন, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জগৎসংসার চলছে না কিংবা তাঁর নীতির মাপে মনুষ্যচরিত্রের কোর্তা কর্তিত হয় নি। অত্যুগ্র উৎসাহের বশে তিনি যে নৈতিক বিশ্বাস আঁকড়ে আছেন তা একটি প্রান্তীয় বিশ্বাস, এই চূড়ান্ত বিশ্বাসটিকে সাধারণ মনুষ্যস্বভাবের উপর জোর করে চাপানোর অর্থ হয় না। গড়পরতা সাধারণ মানুষ, সমাজের দশজন, প্রান্তীয় ভাবাদর্শের দ্বারা চালিত হয় না ; তারা শুভ ও অশুভ সু ও কু পাপ ও পুণ্য—এই দ্বৈত মনোভাবের অধীন। তাদের স্বীকার করতে গেলে তাদের এই ভালমন্দ-মেশানো

মিশ্র ব্যক্তিত্বটিকেও স্বীকার করে নিতে হবে, এর আর চারা নেই। একটি কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা দরকার। সাধারণ মানুষের আচরণ নামক বস্তুটি বহু বিচিত্র ভাবধারার যোগবিয়োগের একটি 'সামান্য' ফল। বহু বিচিত্র চিন্তার মন্থনের প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় একই আধারে বিধৃত হলাহলরূপে তার প্রকাশ। সকল মানুষের আচরণের গড় কষে আমরা এই সাধারণ আচরণ রূপ ফলশ্রুতিটুকু লাভ করি। স্পষ্টতঃই এটি একটি মধ্যবর্তী পথ, এর উপর প্রান্তবর্তী চূড়ান্ত মতের দাবি চাপাতে গেলে অন্যায় হয়।

নীতিবাদীর উচিত নিজের মত জগৎ-সংসারের উপর না চাপিয়ে জগৎ-সংসারের মাপে নিজেকে খানিকটা সংশোধন করা। তা হলে তিনি আর পদে পদে অনৈক্য দেখতে পাবেন না, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কিছু-কিছু মিলও খুঁজে পাবেন। স্বীয় নীতিবাদী অহংকারের দূর-দুর্গে বাস করে তিনি এতকাল সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যবধানই শুধু অনুভব করেছেন, আর একটু সহানুভূতির সঙ্গে মানুষকে বিচার করলে তাঁকে আর এই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় না। নিজের দুরূহ আদর্শের মাপকাঠিতে মানুষ ও তার কাজকে বিচার করতে গিয়ে এতাবৎ প্রায় প্রতিটি মানবীয় আচরণকে তিনি ত্রুটিযুক্ত মনে করেছেন, এজন্য তাঁর অশান্তির অবধি ছিল না। সংসারের সাধারণ দশজনার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে তিনি পদে পদে বিব্রত বোধ করেছেন এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিমুখতা কুড়িয়েছেন। কল্পিত নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে একটু ঢিল দিলেই তিনি দেখতে পাবেন, পরিপার্শ্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সহজতর হয়ে এসেছে, দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর আর পূর্বেকার বিকার নেই, মানুষকে আত্মীয়রূপে পেয়ে তিনি ধন্য হয়েছেন।

সাহিত্য ও সমাজ

সাহিত্যানুশীলনের দুই দিক্। একটি দিক্ লেখকের মনোজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট; অপরটির বিস্তার লেখকের ব্যাবহারিক জীবনের মধ্যে। অর্থাৎ একটি আত্মগত; অপরটি সমাজগত। সাহিত্যের এই শেষোক্ত দিক্ নিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করব।

লেখকমাত্রেই সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের আর দশজনার মত তাকেও সমাজের ভিতরে চলাফেরা করতে হয় এবং এজন্য সমাজকে নিয়মমাফিক মূল্য ধরে দিতে হয়। সমাজে থাকতে পাব অথচ তার মাশুল যোগাব না—এ হয় না। যূথবদ্ধ হয়ে চলবার সুবিধা অগুনতি, তেমনই দায়িত্বও অনেক। বলাই বাহুল্য, অপর সকলের সঙ্গে লেখকদেরও এই সকল দায়িত্ব সমভাবে পালন করতে হয়। এই দায়িত্ব পালন না করলে সমাজে টিকে থাকবার উপায় নেই, টেকা যায় না।

মোটামুটি ভাবে সামাজিক দায়িত্বকে দুটি স্পষ্টচিহ্নিত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: জীবিকা-অর্জন ও সামাজিকতা-রক্ষা। এ দুটি দায় সকলের পক্ষে সমান গ্রাহ্য, সুতরাং সাহিত্যিকের পক্ষেও। কিন্তু প্রচলিত সমাজব্যবস্থার এমনি ধারাধরন যে, সাহিত্যিকের পক্ষে স্বভাবের বিকার না ঘটিয়ে, স্বীয় বৃত্তিগত কুশলতার ক্ষতি না করে, দায় দুটি সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব কি না সন্দেহ। সাধারণ কর্তব্যপালনের ক্ষেত্রে সাহিত্যিক তথা লেখকের কথা বিশেষভাবে বলবার উদ্দেশ্য এই যে, লেখার কাজের জাতটাই কিঞ্চিৎ আলাদা রকমের। তার জন্য যে-পরিমাণ শিক্ষাদীক্ষা প্রস্তুতি অনুশীলন ধৈর্য ও অধ্যবসায় প্রয়োজন—এমন বোধ করি আর কোন কিছুর বেলায়ই প্রয়োজন হয় না। শিল্পের আর যে সকল বিভাগ আছে—যথা, সঙ্গীত চিত্রকলা নৃত্য অভিনয় ইত্যাদি, এগুলিতেও মোটামুটি সাফল্য অর্জন করতে হলে জীবনব্যাপী প্রযত্ন আর অভিনিবেশের প্রয়োজন; সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে প্রয়োজন বুঝি আরও বেশী অবিসম্বাদী, আরও বেশী একান্ত। শুদ্ধমাত্র ভাষারীতি আয়ত্ত করতেই একটা গোটা জীবন কেটে যাবার দাখিল, তার উপর সাহিত্যিকের আরও কত কী করণীয় থাকে। তাঁকে কল্পনার অনুশীলন করতে হয়, চিন্তার অনুশীলন করতে হয়, সংসারের বিচিত্র জিনিস দেখতে হয় জানতে হয়, প্রচুর অধ্যয়ন করতে হয়, সজ্ঞান চেষ্টার দ্বারা স্বভাবকে নিয়ত

মধুর ও চিত্তবৃত্তিকে সুকুমারভাবাপন্ন রাখতে হয়, সর্বোপরি এ-সবের সমবায়ে আত্মপ্রকাশের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী বা স্টাইল আত্মগত করতে হয়। এ সব কাজ যেমন-তেমন নয়; এদের যে কোন একটি কাজ অভ্যাস করতে গেলেই বোঝা যায় সাহিত্যিকের অগ্রগমনের পথে দুরূহতা প্রচণ্ড, বাধা বিস্তর। তবু এই দুরূহতা-জয়ের মধ্যেই সাহিত্যিকের সাফল্যের নিশানা, সাহিত্যের সার্থকতা।

সজ্ঞান চেষ্টার দ্বারা স্বভাবকে সুকুমার রাখবার কথায় অনেকে মনে করতে পারেন একপ্রকার কৃত্রিম ভালমানুষির উপর এখানে জোর দেওয়া হয়েছে। মোটেই তা নয়। স্বভাবকে মধুর আর সুকুমার রাখবার কাজটি সদা-সতর্ক সজ্ঞান চেষ্টামূলক কাজ, সে চেষ্টায় এতটুকু ঢিল দেবার জো নেই। ঢিল দিয়েছ কি যে-কোন মুহূর্তে স্বভাব আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। গিয়েও থাকে। সাহিত্যিক-শিল্পীমাত্রের পক্ষেই স্বভাবমাধুর্য অর্জনীয় এই জন্য যে, শিল্পী-সাহিত্যিকের বৃত্তির বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কাজের ধরনটাই সেই প্রয়োজনের কারক। যে জগতে শিল্পী-সাহিত্যিকের বিচরণ, তার ভূমি ঔদার্যের দ্বারা মণ্ডিত, তার পথ সহানুভূতির দ্বারা আস্তৃত। প্রেম আর করুণার সদর-দরজার চাবিকাঠি হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত কারও সে জগতে প্রবেশের উপায় নেই। শিল্পী-সাহিত্যিক বাইরে রুক্ষস্বভাব হতে পারেন, উপলক্ষবিশেষে তাঁর রূঢ় আর নিষ্করুণ হওয়াটাও আশ্চর্য নয়, কিন্তু অন্তর্স্বভাব তাঁর কোমল হওয়া চাই। এ কোমলতা যাঁর মধ্যে নেই বা অভ্যাসের দ্বারা অধিগত হয় নি, তাঁর পক্ষে সাহিত্যিক হওয়ার চেষ্টা দুরাশা। বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত সকলের স্বভাবেই অল্পবিস্তর কোমলতা থাকে, কারও কারও জীবনে দৈবগতিকে সে কোমলতা পরিণত বয়স অবধি টিকে যায়; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধির সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে এ কোমলতার বিলোপ ঘটতে থাকে। তারপর থেকে বিধিবদ্ধ সচেতন প্রয়াস দ্বারা স্বভাবমাধুর্যকে আয়ত্ত করবার পালা। এই সাধনায় শিল্পী-সাহিত্যিকের যে রকম অবহিত আর তদ্‌গত হওয়া আবশ্যক এমন আর কারুর নয়। আর কোন কারণে যদি না-ও হয়, সাহিত্যকর্মের সম্যক্ স্ফূর্তির জন্যই এটা দরকার।

এত সব দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করতে পারলে তবে একজন লেখক সত্যিকারের লেখকনামের অধিকারী হন। পূর্বেই বলেছি, এ দু-চার দিনে নিষ্পন্ন হওয়ার বিষয় নয়, এর জন্য একটা গোটা জীবনের প্রস্তুতি আবশ্যক।

এমন প্রস্তুতি, যা কালের দিক্ থেকে নিরবচ্ছিন্ন, অভিনিবেশের দিক্ থেকে অখণ্ড, চেষ্টার দিক্ থেকে নিশ্ছিদ্র। এই অখণ্ড নীরন্ধ্র একবিষয়নিবিষ্ট সাধনার সুযোগ ও অবকাশ আমাদের দেশের লেখকদের জীবনে আছে কি না সেটা ভেবে দেখবার বিষয়।

এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে, লেখকের রচনাকর্ম থেকেই লেখকের জীবিকার উপায় হওয়া উচিত। এতে এক দিকে যেমন লেখকের মনোযোগ বহুধাবিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়, অন্য দিকে লেখকের বৃত্তিগত কুশলতা বাড়ে। অন্যান্য দশটা বৃত্তির মত রচনাকর্মও একটা বৃত্তি, সেই বৃত্তির অনুশীলনে যত বেশী সময় আর উদ্যম নিয়োগ করা যায় ততই সে বৃত্তির পরিস্ফূর্তি। এটা কি ফরমায়েসী রচনা, কি সৃজনধর্মী রচনা—উভয় ধরনের রচনার বেলায়ই খাটে। যাঁরা জীবিকার 'অশুচি' সংস্পর্শ বাঁচিয়ে সাহিত্যকর্ম করবার পক্ষপাতী এবং সাহিত্যকে শুদ্ধমাত্র একটা অবকাশরঞ্জনী আর অবকাশ-কালে-দ্রষ্টব্য বিষয় বলে মনে করেন, তাঁরা সাহিত্যকর্মকে বড় বেশী সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে বিচার করেন। সাহিত্যের সর্বগ্রাসী দাবি তাঁরা তলিয়ে দেখেছেন বলে বোধ হয় না। তা যদি দেখতেন, অর্থসংস্পর্শ থেকে সাহিত্যকে দূরে রাখবার অনুকূলে এমন একতরফা রায় জারি করতেন না। টাকার অশুচি মলিন স্পর্শে পরমহংসদেবের হাত বেঁকে যেত; অর্থকরী সাহিত্যের ব্যাপারে এঁদের স্পর্শালুতা পরমহংসদেবের স্পর্শালুতাকেও ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম। টাকার জন্যে লেখা! ছি ছি, তাও কি হয়? সাহিত্যকে কি শেষ পর্যন্ত বানিয়াবৃত্তির স্তরে নামিয়ে আনতে হবে? সাহিত্যের উপভোগ্যতার দাম আর দশটা ভোগ্যপণ্যের মত খোলা হাটে ওজন দরে টাকা দিয়ে চোকাতে হবে? সাহিত্যসৃষ্টিকে অর্থমূল্যের বিনিময়ে ক্রেতব্য পণ্য মনে করলে সাহিত্যের আর কৌলীন্য রইল কি? ইত্যাদি ও প্রভৃতি।

সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী আভিজাত্যবাদীদের সম্বন্ধে যে কথা, এই মনোবৃত্তিওয়ালাদের সম্পর্কেও সেই কথা। এঁদের অবকাশ আছে, তাই এঁরা কেবলমাত্র অবকাশের সীমার মধ্যে সাহিত্যকে গুটিয়ে আনতে চান। এঁদের দৃষ্টিতে সাহিত্য হল—অবকাশের আকাশে দূরবিলম্বিত চাঁদ; কর্মজীবনের ব্যস্ততার মাটিতে তাকে টেনে নামাবার চেষ্টা, এঁদের মতে, উদ্বাহু

বামনের চেষ্টার মতই অসার্থক। কিন্তু এই সহজ কথাটা এঁরা ভুলে যান যে, সাহিত্যকে কেবলমাত্র বিশ্রামকালের অভিনিবেশের বিষয় মনে করলে সাহিত্যচর্চায় খণ্ডভাবে আত্মনিয়োগ করা হয়, তাতে সাহিত্যের অমর্যাদা ঘটানো হয়। এর দ্বারা জাতির জীবনে সাহিত্যের ভূমিকাকে ছোট করে দেখা হয়। ওটা প্রকারান্তরে সাহিত্যকে কেবলমাত্র সুবিধাভোগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার এবং অবকাশহীন মানুষদের দূরে ঠেলবার ষড়যন্ত্রবিশেষ। সাহিত্যের কল্যাণকামীরা কোনক্রমেই এই ব্যবস্থায় সায় দিতে পারেন না।

জাতীয় জীবনের উপর সাহিত্যের প্রভাব সর্বব্যাপী, সুতরাং সাহিত্যকর্ম সকল সময়ের কর্ম হবে এবং তা সাহিত্যিকের জীবিকার একমাত্র উপায় হবে—এই দাবি এমন কিছু অযৌক্তিক নয়। বরং এইটেই স্বাভাবিক, এইটেই প্রত্যাশিত। বিশ্রামকালীন সাহিত্য কার্যত: এক-একটা দমকা প্রেরণার ফলজনিত সাহিত্য; তার ভিতর শৃঙ্খলার চাইতে আবেগের উৎক্ষেপটাই বড় কথা। এ-জাতীয় সাহিত্যানুশীলন দ্বারা অবকাশের ফাঁক ভরানো যায়, জীবনের ফাঁক ভরানো যায় না। এই-যে মধ্যে মধ্যে বিরতিছেদযুক্ত, আকস্মিক প্রেরণাতাড়িত সাহিত্যসৃষ্টি, এতে সাহিত্যের সুমহৎ সর্বাত্মক দাবি প্রায়শ অপূর্ণ থাকে। মানুষের মনের উপর অবকাশসৃষ্ট সাহিত্যের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী নয়। যে সাহিত্য সমগ্র জীবনসাধনার অঙ্গীভূত সৃষ্টি নয়, সে সাহিত্যের দ্বারা মনের সকল প্রত্যাশার পূরণ হতে পারে না। সাহিত্যের ইতিহাসে এ কথার ব্যতিক্রম নেই এমন নয়, বরং খতিয়ে দেখতে গেলে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তই সমধিক; বিশ্ব-সাহিত্যের অনেক সেরা বইই অবকাশের দান। কিন্তু এর দ্বারা ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তই শুধু পুঞ্জীভূত হয়েছে, নিয়মের প্রতিষ্ঠা হয় নি। ভালর দ্বারা 'ভালতর'র সম্ভাবনাকে লোপ করা যায় নি। অবকাশসৃষ্ট সাহিত্যকর্মের ভিতর উৎকর্ষের প্রমাণ রয়েছে; কিন্তু এই সাহিত্য অবকাশের ফসল না হয়ে যদি সমগ্র জীবনসাধনার ফলস্বরূপ হত, তবে সেই উৎকর্ষের মান যে আরও অনেক গুণ বেশী বৃদ্ধি পেত না তার নিশ্চয়তা কোথায়? অবকাশকালীন সাহিত্যসৃষ্টিতে অখণ্ড মনোযোগক্ষেপ সম্ভব নয়; জীবনের আর-পাঁচটা কাজের চিন্তার দ্বারা এই মনোযোগ বিক্ষিপ্ত, সুতরাং তা খণ্ডিত আর আংশিক অফলপ্রসূ। সাহিত্য যদি সকল সময়ের কর্ম হত, তবে আর এই অসার্থকতার সম্মুখীন হতে হত না। সাহিত্যকর্মীর পক্ষে যে সব গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক বলে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের

প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করলেই আমরা বুঝতে পারব, সাহিত্যিকের সাধনা সমগ্র জীবনের পরিধির ভিতর বিস্তারিত হলে তবেই এই সকল গুণ যথার্থ আত্মগত হওয়া সম্ভব। আংশিকভাবে সাহিত্য নিয়ে পড়ে থাকলে আংশিকভাবেই শুধু এই গুণগুলি ধরা দিয়ে থাকে; খণ্ডিত সাধনার দ্বারা সাহিত্যিক গুণসমূহের পরিপূর্ণ সুফল কদাচ লভ্য।

কথাটা তা হলে দাঁড়াল এই যে, সাহিত্যসাধনা মানুষের সামগ্রিক জীবনচর্যার বিষয়, তাকে জীবনের একটি অংশবিশেষের পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে তার গুরুত্বকেও সেই সঙ্গে খর্ব করা হয়। বিশেষতঃ আজকের যুগ হচ্ছে স্পেশালাইজেশনের যুগ, সমগ্র জীবনের অভিনিবেশ প্রয়োগ না করলে কোন কাজেই আজ বিধিমতে কুশলতা আয়ত্ত করা যায় না। যে-কোন কাজেই হাত দেওয়া যাক না কেন, তার এত বিভিন্ন দিক্ আর এত বিরাট পরিসর যে, সমগ্র চিন্তা ও চেষ্টা এই দিকে নিবদ্ধ না করলে তাতে পরিপূর্ণ সাফল্যের আশা দূরবর্তী। অন্যান্য কর্মের সম্পর্কে যে কথা, সাহিত্যকর্ম সম্পর্কেও সেই কথা। বরং সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে এ কথা আরও বিশেষভাবে খাটে। সাহিত্যের সাধনা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে চিরকালই দুরূহ সাধনাগুলির অন্যতম ছিল। আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে সে সাধনার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। নূতন কালের সাহিত্যিকদের চিন্তা-ভাবনার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, সমাজ-চেতনা তীব্রতর হয়েছে, তদনুপাতে দায়িত্বও বহুগুণ বেড়েছে। আজ শুধু আনন্দ পরিবেশন করলেই সাহিত্যের কাজ ফুরোল না, তাকে পথের নির্দেশও দিতে হয়। নানা অনৈশ্চিত্য বিক্ষোভ সংক্ষোভ দ্বিধাদ্বন্দ্বপীড়িত আধুনিক মানুষকে শান্তির হদিস দেওয়াটাও সাহিত্যের একটা মস্ত কাজ। স্বধর্মে তদ্‌গত না হলে, অভিনিবেশ আর প্রয়াস সর্বগ্রাসী না হলে, এই বহুবিধ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করা কঠিন।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যসেবার আদর্শ চিরকাল সামগ্রিক জীবনচর্যার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্যাস-বাল্মীকির জীবনধারা থেকেই এ কথার প্রমাণ মেলে। বাল্মীকি কি ব্যাসদেব ঋষি ছিলেন—তার মানে এ নয় যে, জীবনপরাঙ্মুখ হয়ে তাঁরা পারত্রিক সাধনায় নিরত ছিলেন; তার মানে এই যে, বিধিবদ্ধ সংযমশাসন ও শৃঙ্খলার দ্বারা তাঁরা কাব্যসাধনাকে জীবনসাধনায় রূপান্তরিত করেছিলেন। ব্যাস-বাল্মীকির ব্যক্তিত্বের মধ্যে কাব্যসাধনা ও জীবনচর্যা একীভূত হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ঋষি সন্দেহ নেই, কিন্তু কবি-ঋষি।

তাঁদের আর্যত্ব কল্পনা আর সৃজনের বেগে পূর্ণ। অধ্যাত্মবাদী চিন্তা ও অভীপ্সার উপাদান তাঁদের সাধনার মধ্যে ছিল না এমন নয়, তবে এই অধ্যাত্মবাদ জীবনবিমুখতা নয়; বিশ্বব্যবস্থার অন্তর্নিহিত মূলীভূত ঐক্যের চিন্তা কিংবা পরমসত্তার ধ্যান কাব্যচিন্তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে যতটা প্রয়োজন, ততটা পরিমাণ অধ্যাত্মবাদই তাঁদের গ্রহণীয় ছিল। এঁদের ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদ জীবনজিজ্ঞাসার নামান্তর, যা কাব্যসাধনারই একটা দিক্। দর্শন আর কাব্যের ভিতর আত্মীয়তা সুবিদিত।

কাব্যসাধনা আর জীবনচর্যার সুসমঞ্জস সমন্বয়ের আর একটি পূর্ণ আদর্শ হলেন এ যুগের রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যসাধনাকে জীবনের সঙ্গে এমন অখণ্ডভাবে একীভূত করতে বোধ করি আর কোন দেশের কোন কবিই পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসাধনাকে পূর্ণ জীবনব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন, সেই কারণে সাহিত্যকে এত বিভিন্ন দিক্ থেকে তিনি ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করে যেতে পেরেছেন। 'ফুলে-ফলে' কথাটা এই ক্ষেত্রে নিতান্ত অলঙ্কার নয়, আক্ষরিক অর্থে সত্য। ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক, ফল জ্ঞানের প্রতীক। সৌন্দর্য এবং জ্ঞান এই দুটি জিনিসই কবি আমাদের দু হাতে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে গেছেন। কালিদাসের কাব্যসাধনার মধ্যেও আমরা সৌন্দর্য এবং জ্ঞানের সমন্বয় দেখতে পাই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত তাঁর প্রতিভা এত বহুবিচিত্র ছিল না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার এই-যে বহুবৈচিত্র্য, তাঁর ব্যক্তিত্বের এই-যে সুবিশাল মহিমা—এর মূল রয়েছে তাঁর সাহিত্যসাধনার অখণ্ডতার মধ্যে। এ যুগের অপর দুই শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে রবীন্দ্রনাথের চাইতে কিছু কম প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন তা নয়; বরং এ কথা স্বীকার করাই ভাল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা আরও বেশী ক্ষুরধার ছিল, মাইকেলের ব্যক্তিত্ব আরও বেশী আকর্ষণীয় ছিল। তবু যে তাঁরা জাতীয় চিত্তের উপর রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি—অন্য অনেক কারণের ভিতর তার একটি কারণ কি এই নয় যে, তাঁদের সাহিত্যসাধনা তাঁদের জীবনচর্যার সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে অন্বিত হয় নি, তাঁদের জীবনে আর সাহিত্যে বিরোধ ছিল? অন্যান্য দেশের সাহিত্যের ইতিহাস থেকেও এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা চলে। দেখা গেছে, সাহিত্যকে যাঁরাই অখণ্ড জীবনসাধনারূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই মানবচিত্তের উপর কোন-না-কোন ভাবে অমোচনীয় ছাপ রেখে গেছেন। প্রমাণস্বরূপ, দান্তে, শেক্স্পীয়র, গ্যেটে,

শেলী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ব্রাউনিং, এবং এ যুগের টলস্টয়, রলাঁ প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। টলস্টয় ঋষি আখ্যা পেয়েছেন তাঁর আপাতদৃশ্য আর্য কান্তির জন্য নয়, মূলতঃ তাঁর সাহিত্যচর্যা আর জীবনচর্যার অখণ্ডত্বের জন্যই। এই অখণ্ডত্বের আদর্শকে যে লেখক নিজ জীবনে রূপ দিতে পারেন তাঁর সাহিত্যের আর মার নেই।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, আজকের দিনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর প্রস্তাবিত আদর্শকে আঁকড়ে থাকা বড়ই কঠিন। সামাজিক পরিবেশটাই এর প্রতিকূল। দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, সাহিত্যিককে আজ শুদ্ধমাত্র টিকে থাকবার জন্যই সর্বসময় প্রাণপণ সংগ্রামে নিরত থাকতে হয়। সাহিত্যের অখণ্ড আদর্শের অনুসরণ তো দূরস্থান, যা দিনকাল উপস্থিত তাতে সাহিত্যকে আঁকড়ে থাকাই কঠিন। সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা সত্যি সত্যি উদ্যম ও যত্নশীল এবং সাহিত্যকে যথার্থই জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করতে চান, তাঁদের পথে বাধা আরও দুস্তর। সমাজের কাছ থেকে বিশেষ কোন আনুকূল্য তাঁরা পান না।

সমাজের এই ঔদাসীন্যের মূলে দুটি কারণ। প্রথমতঃ, শিক্ষাক্ষেত্রে দেশের অনগ্রসরতা; দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ধারক ও নায়কদের মধ্যে সাহিত্যের মর্যাদা সম্পর্কে যথোচিত চেতনার অভাব। একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের প্রত্যক্ষ কৃতিত্বের পিছনে কী কঠিন জীবনব্যাপী পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও চিন্তা অপ্রত্যক্ষ থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের মনে কোন ধারণাই নেই। এঁদের বিশ্বাস, সাহিত্যিকেরা স্বয়ম্ভু, সাহিত্যিকদের লেখনক্ষমতা বিধিনির্দিষ্ট নিয়তিবিশেষ। লেখকেরা যে লিখতে পারেন সেটা সাধনার বলে নয়, যথেচ্ছ কলম চালাবার দুষ্প্রবৃত্তি সংযত করতে পারেন না বলেই তাঁরা লেখক। সমাজের আর দশটা বৃত্তিজীবীর বেলায় যে অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য পুরস্কৃত, সাহিত্যিকদের বেলায় সে নৈপুণ্যের দাম নেই। দাম যদি থাকত, এ সমাজে সাহিত্যিক শুধু সাহিত্যের উপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকতে পারতেন, জীবিকানির্বাহের জন্য তাঁকে নানা রকম উঞ্ছবৃত্তি করতে হত না। আমাদের আজকের দিনের লেখকদের মধ্যে কেউ সরকারী বা সদাগরী আপিসের চাকুরে, কেউ ব্যাঙ্ক-ক্লার্ক, কেউ

স্কুল-মাস্টার, কেউ কলেজের অধ্যাপক, কেউ সাংবাদিক, কেউ আর-কিছু। যিনি যেখানেই কাজ করুন না কেন, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সামান্য একটি মাসান্তিক অর্থমূল্যের টোপ সামনে ঝুলিয়ে রেখে নিয়োজিতের সমগ্র উদ্যমটুকু প্রতিষ্ঠানের সেবায় আহরণ করে নেন; সেই প্রবল শোষণপ্রক্রিয়ার পর সাহিত্যসেবার জন্য লেখকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত উদ্যম বড় একটা আর থাকে না। তবু যে আমাদের দেশের লেখকেরা লিখতে পারেন, লেখেন, তাকে অভ্যাসদোষ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সাহিত্যিকবৃন্দ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন না, তার কারণ তাঁরা বিবেকী মানুষ, অর্থমূল্য গ্রহণ করলে পরিশ্রম দ্বারা সেই মূল্য শোধ করতে হয়—তাঁরা জানেন; কিন্তু এই বিবেকচেতনার ছিদ্রপথে কী মর্মান্তিক অন্যায়-অবিচারই না সাহিত্যসেবীদের উপর অনুষ্ঠিত হচ্ছে!

এতে আখেরে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অবশ্য সমাজ নিজে, কিন্তু সমাজের উল্লাস তাতেই যাতে তার নিজের অবধারিত ক্ষতি। কি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, কি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অধীনস্থ কর্মীদের শ্রমশক্তি, সময় ও উদ্যম পূর্ণমাত্রায় গ্রাস করতে উদ্যত। সাত-আট ঘণ্টা একটানা কাজ এবং এই কাজে আসা-যাওয়ার প্রস্তুতি বাবদে আরও দু-তিন ঘণ্টা, একুনে এই ন-দশ ঘণ্টা সময় যে কোন আপিস-কর্মচারীকে চাকুরির জন্য ছেড়ে দিতে হয়। তারপর আর সময় কীই বা থাকে? বিশেষ করে সেই কর্মচারী যদি সাহিত্যযশঃপ্রার্থী হন, লেখবার বদ্ অভ্যাস যদি তাঁর থেকে থাকে, তবে তো আরও মুশকিল। তাঁকে দুই সম্পূর্ণ বিপরীত জগতের মধ্যে সঞ্চরণের কঠিন অভ্যাস সাধন করতে হয়। ঘড়ির দোলকের মত একবার তিনি কর্মজগতের প্রান্তে আসেন, আবার বিপরীত ঠেলা খেয়ে অবসরের জগতের বিবরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এতে কোন জগতেই সম্পূর্ণ বিচরণ হয় না। এ-কাজ করতে গেলে ও-কাজ আটকে থাকে, ও-কাজ করতে গেলে এ-কাজ বাধা পায়। দ্বিধাবিভক্ত মন সর্বদা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েই থাকে। এতে কারও লাভ নেই—না ব্যক্তির, না সমাজের। যে-কোন কল্যাণব্রতী সমাজ-ব্যবস্থার লক্ষ্য হল মানুষকে তার স্বীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী কর্মের দ্বারা জীবিকা-অর্জনের স্বাধীনতা দান এবং সেই আকাঙ্ক্ষিত কর্মের মধ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সম্যক্ পরিস্ফূর্তি সাধন। কিন্তু আমাদের সমাজের ব্যবস্থাই অন্য রকম। যার যা কাজ নয় তাকে সে কাজ জোর-করে-করানোর মধ্যে এক

প্রকার সাদীয় (sadist) আনন্দ আছে, এই বিকৃত আনন্দের প্রতি আমাদের সমাজকর্তাদের লোভ প্রচণ্ড। শক্তির অপচয় তাঁরা দেখেও দেখেন না; বরং সর্বপ্রকার সুকুমারচিত্তবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের প্রতি দুর্জ্ঞেয় এক ঈর্ষা আর হীনমন্যতাবশতঃ তাঁরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শক্তির অপচয় ঘটানোয় সাহায্য করেন বেশী। স্বভাব-লেখককে লিখতে সুযোগ না দিয়ে ব্যাঙ্কের লেজারের খাতায় তাঁকে আবদ্ধ রাখার নীতি চূড়ান্ত হৃদয়হীনতার পরিচায়ক।

সকল সময়ের কর্মরূপে সাহিত্যে আত্মনিয়োগের স্বাধীনতা এবং সেই সূত্রে জীবিকানির্বাহের সুযোগ আমাদের দেশে যদি থাকত, এমন শোচনীয় দশা প্রত্যক্ষ করতে হত না। সাহিত্যকর্মী মাত্রই বিশেষ বৃত্তিগত কুশলতার অধিকারী; সুতরাং সেই কুশলতার মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ থাকা উচিত। শুধু তাই নয়, এই কুশলতা তাঁর জীবিকারও মুখ্য উপায় হওয়া উচিত। পাছে এ কথায় ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় সেই জন্য বলে রাখি, সাহিত্যিক সাহিত্যকর্মকে অবলম্বন করবেন জীবিকার তাড়নায় নয়, দুর্নিবার আত্মপ্রকাশেরই তাড়নায়। জীবিকার প্রশ্ন দেখা দেবে পরে, যদিও প্রশ্নটি অপরিহার্য। শুদ্ধমাত্র জীবিকার তাগিদে লেখনী-ধারণের অর্থ হয় না, ওটা বৈশ্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক, সুতরাং ত্যাজ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার, প্রতি লেখকেরই চোখের সামনে উৎকর্ষের এমন একটা উচ্চ মান থাকা উচিত এবং সেই মানের বশবর্তিতায় এমন সেরা কিছু লেখা উচিত, যার দ্বারা তাঁর জীবিকার মীমাংসা আপনা থেকেই হয়ে যায়। অর্থাৎ জীবিকার প্রশ্ন incidental, মুখ্য নয়,—যদিও এই নজিরে জীবিকার প্রশ্নটিকে কোনক্রমেই পরিহার করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ জীবিকার জন্য লেখনী ধারণ করেন নি, আত্মপ্রকাশই ছিল তাঁর সমস্ত সাহিত্যকর্মের মূল প্রেরণা; কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের উৎকর্ষ এমনই অবিসম্বাদী ও অপ্রতিরোধ্য যে, একই কালে তদ্দ্বারা জীবিকার প্রশ্নেরও সুমীমাংসা হয়ে গিয়েছিল। সরস্বতীর প্রতি লক্ষ্মীর বিমুখতা একটা কথার কথা, বাণীর বরপুত্রের প্রতি লক্ষ্মী খুব বেশী দিন নির্মম হয়ে থাকতে পারেন না।

অতএব সকল দিক্‌ বিচার-বিবেচনা করলে এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, সাহিত্যিকের পক্ষে সাহিত্যকর্মই একমাত্র কর্ম এবং সকল সময়ের কর্ম হওয়া উচিত। দেশ থেকে এমন অবস্থার অবসান ঘটানো উচিত যে-ব্যবস্থাধীনে লেখক লিখতে গেলে পড়বার সুযোগ পান না, পড়তে গেলে

লেখবার সুযোগ পান না। অথচ সাহিত্যকর্মীর জীবনে এ দুয়েরই যুগপৎ প্রয়োজন। আরও বেশী প্রয়োজন জীবনকে তার নানা বিচিত্ররূপে কাছে থেকে দেখা, জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করা। এই বহুদর্শন ও ভূয়োদর্শনের অবকাশ যদি সাহিত্যিকের অধিগম্য না হয়, তবে তিনি কেমন করে নিজের উপর, নিজের কৃত্যের উপর সুবিচার করবেন? আসল কথা, জাতি ও সমাজ-জীবনে সাহিত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট। আমরা মুখে সাহিত্যপ্রীতির বড়াই করি, কিন্তু কার্যকালে আমাদের আত্মরটনার অসারতা ধরা পড়ে। আমাদের আত্মশ্লাঘার ভিত্তি বাস্তব প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়, সুতরাং পল্‌কা। এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার দ্রুত অবসান ঘটানো দরকার। জাতীয় জীবনে সাহিত্য তার যথাযোগ্য পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাহিত্যের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হতে পারে না।

সাহিত্য ও সঙ্ঘ

সাহিত্যসাধনা বস্তুটি চিরকাল নিভৃত চিন্তার অবকাশ রাখে। চিন্তা কল্পনা ভাবনা ধ্যান—সাহিত্যগত প্রতিটি মননেরই উদ্ভব নিভৃতিতে। এই কারণে সাহিত্যের সঙ্গে নিভৃতির যোগ নিগূঢ়। নিভৃতিতে নির্জনতায় সাহিত্য-চিন্তা যেরূপ স্ফূর্তিলাভ করে, জনতার ভিড়ে, কলকোলাহলের ভিতর কখনই সেরূপ স্ফূর্তি লাভ করতে পারে না। কলকোলাহল চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে; পক্ষান্তরে নিভৃতি চিত্তকে সংহত করে। চিত্তের এই সংহতি নিরুদ্বেজিত নিরাসক্ত মননের পক্ষে একান্ত ভাবে আবশ্যক। মন যদি জনতার চাপ বা কোলাহলের দ্বারা প্রপীড়িত থাকে, সে ক্ষেত্রে সাহিত্যসাধনার পক্ষে অপরিহার্য অপক্ষপাত ও নৈর্ব্যক্তিক চিন্তন মনন একটু কঠিন হয়ে পড়ে বইকি। নিভৃতির মনোভূমি পেলে তবেই সাহিত্যকুসুম সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে পারে।

তাই বলে এ কথার মানে এ নয় যে, শিল্পী-সাহিত্যিক শ্রেণীর মানুষকে সদ্যকথিত নিভৃতির সন্ধানে লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ে পর্বতে ধাওয়া করতে হবে। শিল্পী যোগী নয় যে তাঁকে গুহাবাসী হতে হবে। বনবাসী ঋষির ভূমিকাও শিল্পীকে মানায় না। শিল্পীকে এ সমাজের মধ্যেই থাকতে হবে এবং এ সমাজের মধ্যে থেকেই তাঁকে নিভৃতির নির্জনতার সন্ধান করতে হবে। আসলে নিভৃতিও একটি অনুশীলনের যোগ্য বিষয়। তাকে চাইলেই পাওয়া যায় না, তার উপযুক্ত পরিবেশ নিজের মনের ভিতর গড়ে তুলতে হয়। নির্জন পরিবেশকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও অনেকে তার সদ্ব্যবহার করতে জানে না। চিত্তের অশান্ততাই এর কারণ। মন গোড়া থেকেই যদি নানা কারণে উদ্বেজিত উপদ্রুত হয়ে থাকে, নির্জনতার অবসরে তার উদ্বেগের উপশম না-ও হতে পারে; উল্টো, নির্জনতার বাধাবন্ধহীন একাচারিতা তার উদ্বেগ-অশান্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কাজেই নির্জনতকামীর পক্ষে বাহ্যিক এবং মানসিক দুই রকম নির্জনতাই পাওয়া দরকার। মন যখন সব দিক্ দিয়ে শান্ত, কোন-কিছুতেই তাকে আর বিচলিত করা সম্ভব নয়, তখনই যথার্থ নির্জনতা অধিগত হয়েছে বুঝতে হবে।

এত কথা বলা হল শুধু এই বোঝাতে যে, সাহিত্য বা শিল্পসাধনা বস্তুটি নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। দলীয়তার আবহাওয়ায় কখনও সাহিত্যের পরিস্ফূর্তি হতে পারে না। যে নিভৃতি নির্জনতা সাহিত্যিক ও শিল্পীর পক্ষে

একান্ত আবশ্যক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, স্পষ্টতঃই সেটির মূল ব্যক্তিজীবনের ভিতর প্রোথিত। দল বা গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ—যে নামেই আমরা সাহিত্যিক সংস্থাকে আখ্যাত করি না কেন, তার ভিতর নির্জনতার আবহাওয়া সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব নয়। বোধগম্য কারণেই সম্ভব নয়। অনেক মাথা এক সঙ্গে মিলিত হলে মাথাগুনতির হিসাবে বহুর সন্দর্শন মেলে বটে, কিন্তু নিভৃতি নির্জনতা একাচারিতাকে যে তন্মুহূর্তে নিধন করা হয় সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

সঙ্ঘ ঠিক ব্যক্তির উল্টো। যেমন ব্যষ্টির বিপরীত সমষ্টি। ব্যক্তির ভিতর নির্জনতা, সঙ্ঘের ভিতর কোলাহল। নিজের মনের মুখোমুখি হওয়ার, অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ার সুযোগ ব্যক্তিজীবনে অপরিমিত; পক্ষান্তরে সঙ্ঘারামের দেউড়ি পেরোলেই নিজের মনকে আর নিজের ভিতর পাওয়া সম্ভব নয়। যেখানেই সঙ্ঘ সেখানেই একের উপর বহুর প্রাধান্য। সঙ্ঘের দাঁড়িকাটা সীমার ভিতর পা গলিয়েছ কি বহুর মনের সঙ্গে তোমার মন মিশে গেল; ব্যক্তিগত মনকে তখন আর আলাদা করে পাওয়ার উপায় নেই। বহুর সম্মিলিত কোলাহলের চাপে ব্যক্তিমনের অর্ধস্ফুট কাকলি যে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে হাওয়ায় মিশে যায় তার আর ঠিকঠিকানা থাকে না।

এই কারণে দেখতে পাই, মাথা মিলিয়ে আর যা-ই করা সম্ভব হোক না কেন, সাহিত্যসাধনা সম্ভব নয়। সাহিত্যসাধনার সৌকর্যের পক্ষে সেই অতি পুরাতন একাচারিতার পথই সবচাইতে প্রশস্ত। যুগভেদে সাহিত্যিক ধ্যান-ধারণার আজ পর্যন্ত কত রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল, কিন্তু এই একটি বিষয়ে সাহিত্যের আদর্শ আজও বোধ হয় অপরিবর্তিত যে, সাহিত্য দল বেঁধে গড়ার জিনিস নয়, মনে মনে গড়ার জিনিস। সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতে হলে শিল্পীকে জনকোলাহল থেকে সরে এসে নিজের মনের ভিতর তলিয়ে যেতেই হবে—এর আর চারা নেই। দল বেঁধে সাহিত্যিকেরা সংখ্যায় ভারী হতে পারেন, তার বেশী নয়। সাহিত্যের ধার চিরকালই নিভৃতির চকিত বিদ্যুচ্ছটা থেকে আহৃতব্য।

দল বেঁধে কেন সাহিত্য হয় না সেটি আরও একটু গভীর ভাবে তলিয়ে দেখা যেতে পারে। দলের একটা ধর্মই হচ্ছে ব্যক্তিমনকে পরাভূত করা। অনেকগুলি মাথা একটি সাধারণ ভূমিতে এসে যখন একত্র সম্মিলিত হয়, তখন মস্তিষ্কগুলির ক্রিয়াশীলতা আর ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না, সবগুলি মাথা এক সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা সম্মিলিত কিন্তু স্বতন্ত্র মাথার উদ্ভব হয়। এই-যে

যৌথ মস্তিষ্কের জন্ম হল, এর ধরনধারণ ব্যক্তিমস্তিষ্কের ধরনধারণ থেকে একেবারেই আলাদা, যদিচ অনেকগুলি ব্যক্তি-মস্তিষ্কের সমবায়েই এর জন্ম। এ যেন অনেকটা দার্শনিক হেগেল কথিত ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত বিদেহী রাষ্ট্রের মত যৌগিক ব্যাপার। ব্যক্তিরূপ সজীব পদার্থের সমষ্টির দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হলেও ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যেমন রাষ্ট্রে আরোপিতব্য নয়, পক্ষান্তরে রাষ্ট্রকে একটি আবস্ট্র্যাক্ট্‌ আইডিয়া রূপে দেখলেই তাকে যথার্থ দেখা হয়, তেমনি যৌথ মনকেও ব্যক্তিমন থেকে স্বতন্ত্র চোখে দেখলে তবেই তার যথার্থ স্বরূপের পরিচয় লওয়া হয়। আসলে ব্যক্তিমন আর যৌথমনের মধ্যে গোড়াতেই তফাৎ। ব্যক্তিমন স্বাতন্ত্র্যধর্মী, যৌথমন স্বাতন্ত্র্যকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার পক্ষপাতী। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের কোণা ও ধার সম্পূর্ণ ক্ষয় করে না ফেলা পর্যন্ত এবং সব বৈশিষ্ট্যকে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যহীন মামুলিত্বে পর্যবসিত না করা পর্যন্ত যৌথমনের স্বস্তি নেই। বড় বড় দার্শনিক, শিল্পী ও মনীষীরা চিরকাল জনতার মনস্তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। শেক্‌স্‌পীয়্যর তাঁর 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে গণ-মনস্তত্ত্বের কী নির্মম সমালোচনা করেছেন সে কথা অনেকেই জানেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক রূপক-নাট্যে জনতার মুখের সংলাপের মধ্য দিয়ে শেক্‌সপীয়্যরের মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মুক্তধারা', 'অরূপরতন'-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের এই দুই মহাকবির জনতাচিত্রণ থেকে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, জনতার বিশেষ ধ্যানধারণাযুক্ত নিজস্ব কোন মন নেই, জনতার মন হাওয়ার গতি অনুসরণ করে চলে। যখন যে দিকে হাওয়া বয় সেইদিকেই তার প্রবণতা। সে মনের পিছনে যদি কোন বদ্ধমূল চিন্তা ও বিশ্বাসের পোষকতা থাকত, তা হলে তা কখনও খামখেয়ালী হতে পারত না। এই মুহূর্তে এক কথা পর মুহূর্তে অন্য কথা শুধু সে-ই বলতে পারে, এই মুহূর্তে এক মত পর মুহূর্তে অন্য মত শুধু সে-ই প্রচার করতে পারে, যার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি দুর্বল, চিন্তাশক্তি নগণ্য। অনেক মাথার সমবায়ে জনতার মাথা তৈরী হলেও সে মাথায় বিশেষ কোন পদার্থ নেই। মন নামক মূল্যবান বস্তুটিকে বাহির-দরজায় ফেলে রেখেই জনতার চিন্তার রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা। এ-জাতীয় চেষ্টার ফল প্রায়শঃ ব্যর্থ হতে বাধ্য তা না বললেও চলে।

সঙ্ঘ জনতারই একটি প্রতিরূপ মাত্র। জনতার যা দোষ তা সঙ্ঘের প্রতিও সমান আরোপিতব্য। অনেক মাথা একসঙ্গে মিললেই আর মাথার অস্তিত্ব

থাকে না। সঙ্ঘের শরণার্থী সাহিত্যিকগণ প্রত্যেকেই হয়তো ব্যক্তিগত স্তরে উচ্চ সৃজনীশক্তির অধিকারী কিন্তু যেই মুহূর্তে তাঁরা সঙ্ঘ বা সমিতির অন্তর্ভুক্ত হলেন অমনি তাঁদের প্রতিভা আংশিক বন্ধ্যা হয়ে গেল। সঙ্ঘের ধর্মই হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে অবদমিত করে তার উপর সঙ্ঘশক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা। প্রত্যেকেই কিছু কিছু করে মূল্য ধরে না দিলে সঙ্ঘের বিজয়কেতন ওড়ানো সম্ভব হয় না। অন্যান্য ধরনের প্রতিষ্ঠানের বেলায় হয়তো ব্যক্তির এইরূপ মূল্যদানে বিশেষ কিছু যায়-আসে না—ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য কিয়ৎপরিমাণে বিসর্জন না দিলে সঙ্ঘের সমভূমিতে এসে দাঁড়ানো কঠিন—কিন্তু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের বেলায় অনেক কিছু যায়-আসে। কেন না, শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি সুকুমার কলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিলে শিল্প-সাহিত্যের অনেকখানিই বাদ দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত মনোভূমিতেই শিল্প-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ। কাজেই শিল্প-সাহিত্যের বেলায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্কোচন ও খর্বীকরণকে কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না।

তা বলে সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানের কোনই সার্থকতা নেই এমন কথা বলতে চাই নে। সঙ্ঘের সার্থকতা আছে, তবে তা নিতান্তই সামা[illegible]রের সার্থকতা, এর অতিরিক্ত মর্যাদা সঙ্ঘের উপর আরোপ করলে [illegible] উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে দেখা হয়। যারা এক পথের পথিক, এক-জাতীয় ভাবনার ভাবুক, তারা একসঙ্গে মিলিত হতে চাইবে তাতে সন্দেহ কী। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাকে বহুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞান করলেই তার যথাযথ পরিমাপ করা হয়। তা না করে তার উপর যদি একটা লেবেল এঁটে দেওয়ার দুর্বুদ্ধি জাগে, তাতেই ঘটে যত বিপত্তি। পারস্পরিক হৃদয় ও ভাববিনিময় যে-বন্ধুসমাগমের মূল উদ্দেশ্য, সেই বন্ধুসমাগমকে সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত করে অন্য কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমাগমের আকার দিলে অনুচিত কাজ করা হয়।

পরিতাপের বিষয়, এ-জাতীয় অনুচিত কার্যের দৃষ্টান্ত আজকের বাংলা দেশে ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাজনৈতিক প্রয়োজনে সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে ব্যবহার করবার মনোবৃত্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ মনোবৃত্তি দিন দিনই বেড়ে চলেছে। লক্ষণটিকে আশঙ্কার দৃষ্টিতে না দেখে পারা যায় না। সমধর্মী বা অল্পবিস্তর সম-মতাবলম্বী লেখকগণের একসঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দোষ দেখি না—এই আকাঙ্ক্ষা মনুষ্য-স্বভাবে সহজাত সুতরাং ক্ষমনীয়—কিন্তু সামাজিক মেলামেশার আবরণে সেটি

যদি রাজনৈতিক বা অন্যবিধ কোন অপ-উদ্দেশ্য সাধনের আগ্রহের রূপ নেয়, সে ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হয়। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সামাজিক মিলন, সুতরাং এইটেই প্রত্যাশিত যে সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রেই তার তৎপরতা মুখ্যতঃ সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আধুনিক সঙ্ঘবিলাসীরা এই সীমা আর মেনে চলছেন না। তাঁরা সঙ্ঘগঠনের নামে প্রতিটি সঙ্ঘাশ্রয়ী সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত সৃজনী প্রতিভাকে সংকুচিত করে সঙ্ঘের উদ্দেশ্যকেই প্রতিটি শিল্পী-সাহিত্যিকের স্বকীয় উদ্দেশ্য বলে চালাবার চেষ্টা করছেন। শিল্পীর ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর সঙ্ঘের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিলে আর যাই হোক ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পায় না সে কথা নিশ্চিত।

অথচ শিল্পী-সাহিত্যিকের নিকট এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যই সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। মূল্যবান এই কারণে নয় যে, স্বাতন্ত্র্যকে তাঁরা অহংকার পরিতৃপ্তির উপায় মনে করেন—সেই দিক্ থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা দোষাবহ—মূল্যবান এই কারণে যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই হল সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মের মূল উৎস। সংসারে ব্যক্তিভেদে এত বৈচিত্র্য আছে বলেই সৃষ্টিরও এত বৈচিত্র্য। মানুষের মন ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে এত তফাৎ, তাইতে সৃষ্টিও এত বহুমুখী। সৃষ্টির এই বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতা রক্ষা করবার জন্যই আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত। তার বদলে ছাঁচে-গড়া ঐক্যের স্টীমরোলার দিয়ে যদি আমরা সকল বৈচিত্র্যকে সমীকৃত করে ফেলবার চেষ্টা করি, সে ক্ষেত্রে শিল্প-সাহিত্যের পরিণাম চিন্তা করে আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে সংহতি-চেতনা হয়তো আসে, কিন্তু শিল্প-চেতনার মৃত্যু ঘটে। অনেকে এক সঙ্গে দল বেঁধে কাজ করার মধ্যে বেশ একটা জোর আছে জানি, কথায়ই বলে 'দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ,' কিন্তু দেখা দরকার, এই দলবদ্ধতার কারণে অন্য কোন মূল্যবান বস্তুর মূল্যহানি না ঘটে। শিল্পী-সাহিত্যিকদের পক্ষে দল বাঁধবার বেলায় শেষোক্ত বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে। সঙ্ঘবদ্ধ হতে গিয়ে, যৌথ প্রয়াসের সমভূমিতে মিলিত হতে গিয়ে কখন যে তাঁরা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে বসেন সে হিসাব থাকে না।

উপরে দল গড়ার বিপদ সম্পর্কে যে সব কথা বলা হল, রাজনীতিপ্রভাবিত সাহিত্যিক সংস্থাগুলির সম্পর্কে সে কথা বিশেষ ভাবেই প্রযোজ্য। তবে রাজনৈতিক সংস্থাগুলিই যে শুধু এই দোষে দোষী, এমন কথা বললে

সত্যের অপলাপ করা হবে। অরাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাহিত্যিক দল গড়বার নজিরও আমাদের দেশে আছে এবং এ-জাতীয় দল সব সময়ই যে বিশুদ্ধ সাহিত্যবুদ্ধির পোষকতার ফলে গড়ে ওঠে সে কথা সত্য না-ও হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, সুপ্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র কিংবা প্রভাবশালী কোন সাময়িক পত্রিকাকে অবলম্বন করে সাহিত্যিক দল গড়ে ওঠে। নিছক আড্ডা বা সমধর্মী বন্ধুজনদের সঙ্গে মেলামেশার উদ্দেশ্যে এ-জাতীয় দল গড়ে উঠলে বলার কিছু থাকে না, কিন্তু মনে হয় ওই বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির মধ্যেই উক্ত দল গড়ার সবটুকু উদ্দেশ্য নিঃশেষিত হয়ে যায় না, আরও যেন কিছু বাকী থাকে। এ-জাতীয় দলের ধরনধারণের সঙ্গে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাহিত্যিক দলগুলির ধরনধারণের মিল না থাকলেও একটা বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে—ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা। ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা থেকে প্রায়শঃ প্রতিযোগিতার অসুস্থ উত্তেজনার উদ্ভব। কোন্ দল কাকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠবে এই যদি পরস্পরবিরোধী সাহিত্যিক সংস্থাগুলিকে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, সাহিত্যিকের আত্মবিকাশের পক্ষে তার ফল কল্যাণপ্রদ হয় না। এখানেও সাহিত্যিকের স্বাধীনতা সংকুচিত হবার আশঙ্কা পদে পদে।

নিছক সাহিত্যিক আড্ডায় এই জিনিসটি নেই। দু-তিন দশক আগে পর্যন্তও আমাদের দেশে যে সব সাহিত্যিক আড্ডার অস্তিত্ব ছিল এবং যে কয়টি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আড্ডার সংবাদ আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পাই, তাদের ভিতর রাজনীতি অথবা ক্ষমতানীতি এর কোনটারই প্রভাব ছিল না। তার কারণ সে সব আড্ডা নামে এবং কাজে আড্ডাই ছিল, সঙ্ঘ ছিল না। এখন ঘটা করে সাহিত্যিক সংস্থা গড়ে তোলা হয়, তার ভিতর সঙ্ঘশক্তির হদিস হয়তো মেলে, কিন্তু আড্ডার প্রাণবায়ু সেখান থেকে অন্তর্হিত। আঁটঘাঁট বেঁধে গড়ে তোলা সঙ্ঘের মধ্যে খোসমেজাজী বৈঠকী গালগল্পের স্রোত স্বচ্ছন্দভাবে প্রবাহিত হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। আমরা এখন সবাই সঙ্ঘের শরণ নিয়েছি, কিন্তু আড্ডাসুখ ভুলতে বসেছি। সাহিত্যিক দল গড়তে গিয়ে আমরা কতটুকু পেলাম কতটুকুই বা হারালাম তার একটা হিসাবনিকাশ হলে মন্দ হয় না।

চিন্তা-সাহিত্য

সাহিত্যের প্রচলিত পরিভাষা অনুযায়ী আলোচনার সুবিধার্থে সাধারণতঃ কাব্য নাটক উপন্যাস ইত্যাদিকে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য আখ্যা দেওয়া হয় এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সন্দর্ভ-সমালোচনা-জাতীয় রচনাকে সৃষ্টিধর্মিতার বিপরীতলক্ষণযুক্ত সাহিত্য বলে ধরে নেওয়া হয়। শেষোক্ত পর্যায়ের রচনা যেহেতু বিশ্লেষণাত্মক ও যুক্তিসন্ধানী, সেই কারণে তাদের উপর সৃষ্টির ধর্ম আরোপ করতে লৌকিক অভিমত সচরাচর দ্বিধান্বিত হয়। কিন্তু এ রকম ধরাবাঁধা মতামতের কোন-রূপ যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগগুলি এমন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন পরস্পর-নিরপেক্ষ জল-অচল প্রকোষ্ঠ নয় যে একের স্পর্শ-নিঃশ্বাস অপরে লাগলে দুইয়েরই জাত মারা গেল। বস্তুতঃ, সাহিত্যের বিবিধ শাখার মূল্যবিচার প্রসঙ্গে এ রকম ছুৎমার্গী জাতবাঁচানো মনোভাবের কোনই সার্থকতা দেখা যায় না। সাহিত্যে বিভিন্ন শ্রেণীর রচনার মধ্যে মাখামাখি মেশামেশি গোত্রবদল হামেশাই ঘটছে। একের সীমার কোথায় শেষ, অপরের সীমার কোথায় আরম্ভ—এ জিনিস ঠাহর করা আর অন্য যে ক্ষেত্রেই সম্ভব হোক না কেন, সাহিত্যে অন্ততঃ সহজ ব্যাপার নয়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে পার্থক্য সব সময়েই সরু সুতোয় ঝুলে আছে।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সমালোচনার মধ্যেও সৃষ্টিধর্মী আবেগ অনেকখানি পরিমাণে লুকিয়ে থাকে, তবে তাকে চিনে নেবার ক্ষমতা থাকা চাই। গদ্য-সাহিত্য যদিও মূলতঃ যুক্তিনির্ভর এবং বক্তব্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা তার লক্ষ্য, তথাপি বলা চলে না যে তা সৃজনী-আবেগবর্জিত। বক্তব্যের প্রকৃতিভেদে ওই সৃজনী-আবেগের তারতম্য ঘটে থাকে। তবে কোথাও কোথাও তার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিও লক্ষ্যগোচর হয়। যে রচনার উদ্দেশ্য নিছকই তথ্যের স্তূপ পুঞ্জীভূত করা এবং তদ্দ্বারা বহুবার-কথিত পুরাতন কোন মতের চর্বিতচর্বণ, সে-জাতীয় রচনায় সৃজনী-আবেগ থাকা সম্ভব নয়, থাকেও না। পুরাতন লেখকদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি আর ফুটনোট আর কথায় কথায় পুরাতন মতের জাবর কাটাই এই সকল প্রবন্ধের মূল উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়। কী জন্য লেখা, কাদের জন্য লেখা—এ সকল অভিপ্রায় এ ক্ষেত্রে নিতান্ত গৌণবস্তু হয়ে দাঁড়ায়; শুধু স্বীয় ঘর্মনিস্যন্দী শ্রমক্ষমতা, মৌলিকত্বহীনতা আর পরনির্ভরতার পরিচয় লোকচক্ষে প্রকট করে তোলাই সার হয়। লেখকের নূতন কোন চিন্তা পরি-

বেশন, নূতন কোন বক্তব্য প্রচার করবার আছে কি না সেটি বড় কথা নয়, বড় কথা হল পুরাতন বক্তব্যের পুনঃপ্রচারে কিংবা নিতান্ত কোনও এক তুচ্ছ মতের প্রতিষ্ঠায় তিনি কী পরিমাণ তথ্যের আর পরিসংখ্যানের আর উদ্ধৃতির জঞ্জাল জমিয়ে তুলেছেন সেই অবান্তর প্রসঙ্গের বিচার! পাণ্ডিত্য প্রকাশের লোভে এবং পাঠকের কাছ থেকে বাহবা কুড়োবার আশায় আমাদের সাহিত্যের এক শ্রেণীর গদ্য-লেখকের মধ্যে যেন তথ্যের নেশা পেয়ে বসেছে। এঁদের মগজে নানাবিধ তথ্য সর্বদাই কিলবিল করছে। সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের মত এঁরাও শুধু ঘটনা ও চরিত্রের বহিরঙ্গ নিয়েই কাজ করেন; তত্ত্বের শাঁস ফেলে তথ্যের খোলাটুকু শুধু আঁকড়ে ধরেন। বিশ্লেষণের দায় নেই, অন্তরের গভীর ভাবানুভূতির পরিস্ফুটনের চেষ্টা নেই, শুধুই তথ্যের আর উদ্ধৃতির আর অধীত বিদ্যার বিচারবুদ্ধিহীন অলস রোমন্থন! এই যদি গদ্য-সাহিত্যের একাংশ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা হয়, সে ক্ষেত্রে গোটা গদ্য-সাহিত্যের সৃজনী-আবেগ সম্পর্কে সংশয়ের ভাব জাগ্রত হওয়া এমন আর কী আশ্চর্য কথা!

মুশকিল হয়েছে এই যে, এ-জাতীয় তথ্যাচ্ছন্ন আর তথ্যাবিষ্ট প্রবন্ধেরই বাজারদর বেশী। পাঠককে ধোঁকা দেবার এর চেয়ে মোক্ষম অস্ত্র আর নেই। পাঠককে বাগে আনতে চাও, তাঁর চোখে মুঠো মুঠো তথ্যের ধুলো ছিটিয়ে দিতে পারলে সহজেই কার্যসিদ্ধি। আর শুধু পাঠকসাধারণই বা বলি কেন, তথাকথিত বিচক্ষণ মহলও এই তথ্যাবেশজনিত বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত নন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজীয় ভারী ভারী উপাধিক অধ্যাপক-পণ্ডিত-দের মধ্যে এই-জাতীয় রচনারই জয়জয়কার। বক্তব্য যতই বস্তাপচা পুরনো হোক না কেন, তার আষ্টেপৃষ্ঠে তথ্যের প্রলেপ লেপে দিতে পারলে তদ্দর্শনে এক শ্রেণীর প্রবীণ অধ্যাপকের দেহে রোমাঞ্চ-শিহরণ উপস্থিত হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ডক্টরেট-ডিগ্রী-প্রাপ্তির ইতিহাস এই ভাবগদগদ রোমাঞ্চ-শিহরণের ইতিহাস। এ সকল ডক্টরেট-ডিগ্রীর এক প্রান্তে আছে ঘাম-ঝরানো অধ্যবসায়, পরানুকরণ আর পরনির্ভরতা, অভিপ্রায়হীনতা (ডক্টরেট-ডিগ্রী লাভের একটা বৈষয়িক অভিপ্রায় সব ক্ষেত্রেই থাকে অবশ্য) ও নিষ্ফল শ্রম; অন্য প্রান্তে আছে অধ্যাপকদের স্বীয় অস্তিত্ব ও কর্মপ্রয়াসের সার্থকতা প্রতিপাদনের প্রয়াস, তোষামোদ-প্রিয়তা, শ্রমের গুণাগুণ-নির্বিশেষে শ্রমের প্রমাণদৃষ্টে অভিভূত হওয়া-রূপ অনিশ্চিত গুণ। এই দুই প্রান্তীয় কর্মপ্রয়াস আর মনোভাব মিলে আমাদের

সাহিত্যে নিষ্ফল পাণ্ডিত্যের প্রাকার আকাশস্পর্শী হয়ে উঠবার উপক্রম হয়েছে বললে মোটেই সত্যের অপলাপ করা হয় না। অনুচিত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে গদ্য-সাহিত্য আর সৃজনী-আবেগবর্জিত তথ্যভারসর্বস্ব রচনা সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাস্তবিক, একাধিক সাহিত্য-ব্যবসায়ী ব্যক্তি আছেন যাঁদের চোখে শুষ্ক পাণ্ডিত্যের পরিচয়েই সাহিত্যের পরিচয় ও সার্থকতা। রচনায় কী বলা হল সেটি বিচার্য নয়, বিচার্য হল যে কথা বলা হয়েছে তা যতই তুচ্ছ আর অকিঞ্চিৎকর হোক, উপযুক্ত পরিমাণ উদ্ধৃতি আর ফুটনোটের সাহায্যে তা বলা হয়েছে কি না এবং সেই সব ফুটনোট যথাযথভাবে উদ্ধৃত হয়েছে কি না। বক্তব্য জাহান্নমে যাক, লিপিকুশলতা শিকায় তোলা থাক্, শিল্পবিচার ততোধিক বাহু, শুধু তথ্যের সঙিন উঁচানো থাকলেই হল। শাঁস থেকে খোসাকে যেখানে বড় করে দেখা হয় সেখানে সাহিত্যের অধোগতি সুনিশ্চিত। আমাদের সাম্প্রতিক প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্যে এই অধোগতির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে কি না তা ধীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দুই প্রাবন্ধিক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এবং সমালোচকশ্রেষ্ঠ হলেন মোহিতলাল মজুমদার। বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের তুলনা ছিল না, রবীন্দ্রনাথ সমস্তরের পণ্ডিত না হলেও তাঁর অধ্যয়ন ছিল বহুব্যাপ্ত এবং বোধ ও গ্রহণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, এতদুভয়ের কেউই যাকে এখনকার কালের পরিভাষায় তথ্যাশ্রয়ী প্রবন্ধ বলে তার লেখক ছিলেন না। দুজনারই রচনার মধ্যে তথ্যের চাইতে বক্তব্য বড়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় অবশ্য কিছু তথ্যভার আছে, কিন্তু তাঁর মত ক্ষুরধার মনস্বীর লেখনীতে ওইটুকু ভার পাণ্ডিত্যের ন্যূনতম উপকরণ মাত্র, ও না হলে তাঁকে ঠিক মানাত না। কিন্তু বঙ্কিম-রচনায় সর্বত্রই সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে বক্তব্যবিস্তার ও প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক আগ্রহ।। তথ্যস্তূপ কোথাও তাঁর মৌলিকতাকে চাপা দেয় নি। বরং বলবার উদগ্র আগ্রহে কখনও কখনও তিনি বক্তব্যকে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাষণমুখরতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। লেখকের আন্তরিকতা ফেনিলতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনালক্ষণ রবীন্দ্রনাথেও উপস্থিত। বরং কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণেই। রবীন্দ্র-গদ্যরচনায় বক্তব্যই প্রধান। এবং সে বক্তব্যের প্রকাশ

রসভূয়িষ্ঠতায় অনবদ্য। কবিচিত্তের গভীর অনুভূতি এবং একজন প্রথম শ্রেণীর ভাবুকের ভাবনার বিচিত্র প্রবাহ রসে ও জ্ঞানে জড়াজড়ি মাখামাখি হয়ে রবীন্দ্র-গদ্যে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় উদ্ঘাটিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-নিবন্ধের গভীরে একবার প্রবেশ করলে তার প্রকাশের সৌন্দর্যে এমন মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় যে তন্মুহূর্তে অন্য কোন প্রসঙ্গের বিচার, বিশেষতঃ তথ্যসহতার বিচারের প্রশ্ন মনের ভিতর আদৌ জাগ্রত হয় না। কবিত্বের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়, ভাব ও ভাবনার মৌলিকতায়, উপমা উৎপ্রেক্ষা আর অন্যান্য শব্দালঙ্কারের চারুতায় সে এমনিই অনবদ্য জিনিস যে তার ভিতর তথ্যের ভার আছে কি নেই সে বিচার নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। এমন কি প্রবন্ধ-সাহিত্যের যেটি মূল বুনিয়াদ—যুক্তি, তাও কতটা অবলম্বন করা হয়েছে সে বিচারও সাময়িকভাবে চাপা থাকে। রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রচনাকার তার অন্যতর প্রমাণ এই যে, তিনি কদাপি উদ্ধৃতির ধার দিয়েও যান নি। উপনিষদের দুটি-চারটি পরিচিত শ্লোকোচ্চারণ ছাড়া তিনি মতপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরের মুখে ঝাল খেতে আদৌ রাজী ছিলেন না। আর কেনই বা তিনি পরাশ্রয়ী হবেন? নিজেরই তাঁর এত কথা বলবার ছিল এবং কেমন করে সে কথা বলতে হয় সেই শিল্পজ্ঞান এতই বিধিমতে তাঁর আয়ত্ত ছিল যে, পূর্বাচার্যেরা যত বড় মহাজনই হোন তাঁদের কথা চটকাবার তাঁর প্রয়োজন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ শ্রমনিষ্ঠার পরিচয় দেবার জন্য প্রবন্ধরচনায় প্রবৃত্ত হন নি, অধ্যয়নশীলতার ব্যাপ্তি বোঝানোও তাঁর অভিপ্রায় ছিল না; কবিতায় যে কথা বলা যায় না বা বিশদভাবে বলা যায় না তেমন কিছু কথা গদ্যে বলা তাঁর অভীষ্ট ছিল এবং জীবনভোর অজস্র প্রবন্ধে নিবন্ধে সমালোচনায় অতীব মনোজ্ঞ ভাবে সে কথা তিনি বলেও গেছেন। ভাবুকতা আর চিন্তার প্রাচুর্যে, রস আর শিল্পসৌন্দর্যের সমাহারে রবীন্দ্র-গদ্যরচনা ভরপুর।

অথচ সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য বহুব্যাপ্ত ছিল। তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ও কৌতূহল বিচিত্রপথগামী ছিল। নানামুখে প্রসারিত তাঁর রসিক-চিত্তের উন্মুখতা ও গ্রহিষ্ণুতা বিস্ময়ের বিষয়। ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যকে নজির-প্রমাণের দ্বারা, ফুটনোট আর উদ্ধৃতির দ্বারা, প্রবন্ধশেষে চোখ-ধাঁধানো কুঞ্চিকা আর গ্রন্থপঞ্জীর (bibliography) সমাবেশের দ্বারা সমাচ্ছন্ন করে দিতে পারতেন। কিন্তু তেমন শ্রমিকজনোচিত অধ্যবসায়ের দ্বারস্থ হতে তাঁর আত্মমর্যাদায় বেধেছে। অত বড় মৌলিকত্ব আর স্বাতন্ত্র্য-

বাদী লেখক যদি ওই সাধারণ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেবেন তবে সাহিত্যের কোদাল-চালিয়েরা আছেন কী জন্য? যাঁদের নিজস্ব বক্তব্য কিছু নেই, থাকলেও কেমন করে সে বক্তব্য উপস্থাপিত করতে হয় তার প্রকরণ জানা নেই, তাঁরাই অবধারিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমার্কা দাঁত-মুখ-খিঁচানো প্রবন্ধ-নিবন্ধ-প্রস্তাবাদি লিখে থাকেন। শাস্ত্রবচন, authority আর অতীত-কালের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার আতিশয্যে গললগ্নীকৃতবাস যে-কোন প্রতিষ্ঠানের খাতায় নাম লেখানোর অর্থই হল স্বাতন্ত্র্যের অপমৃত্যু। গুরুবাদের আবহাওয়ায় মৌলিকত্ব একদণ্ড তিষ্ঠোতে পারে না।

অন্যদিকে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের কথা বিবেচনা করুন। বক্তব্যের বেগময় স্বচ্ছন্দপ্রবাহী ধারাবাহিকতায় তাঁর গদ্যরচনা কলস্বনা। রসিক ও ভাবুক এই আবেগসমৃদ্ধ মানুষটির এত কথা বলবার ছিল এবং সব সময় তিনি এমনই একটা গভীর ভাবের জগতে অবস্থান করতেন যে, ওই ঐকান্তিক বিবক্ষা আর ভাবতন্ময়তার ফাঁক দিয়ে শুষ্ক তথ্য মোটে মাথা গলাবার অবকাশই পেত না। মোহিতলালের কণ্ঠস্বরের উদাত্তগাম্ভীর্য আর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় সকল প্রকার অসার তথ্যসজ্জাকে অনাবশ্যক ও তুচ্ছ জ্ঞানে আপনার বেগে আপনিই এগিয়ে গেছে। তিনি মৌলিকতার কারবারী ছিলেন, তাঁর কি সাজে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লেখকের মত তথ্যের খড় আর পরিসংখ্যানের কুটো একত্র জড়ো করে তা দিয়ে বালকোচিত রচনার খেলাঘর সাজিয়ে তোলা? যাঁদের স্বকীয় বক্তব্য কম বা নেই বলতে গেলে, যাঁরা পরের কাঁধে ঝুলে পড়বার জন্য আগু বাড়িয়েই আছেন, দেখা যায় তাঁরাই শুধু তথ্য আর সংবাদ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলকোলাহল করেন। কিন্তু দৈবানুগ্রহেই হোক আর ক্ষমতার অনুশীলনের দ্বারাই হোক যে লেখক তৃতীয় নয়নের অধিকারী হয়েছেন, তিনি কেন লৌকিক চোখ দুটির আপাত-সত্য রায়ের উপর পদে পদে নির্ভর করতে যাবেন? ভাবের প্রতিমা যিনি নির্মাণ করতে আগ্রহী, তিনি কি কখনও কাঠামোর খড়বালি নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারেন?

তাই বলে মোহিতলাল তাঁর রচনায় তথ্যজ্ঞানের বিরোধিতা করতেন এমন বলা চলে না। তথ্যের ভ্রান্তিও তাতে বড়-একটা থাকত না। আসলে তথ্যজ্ঞান প্রতি বড় লেখকেরই চেতনায় অনুস্যূত হয়ে থাকে—এ না হলে রচনাকর্মে অগ্রসর হওয়াই যায় না। তবে তাকে তাঁরা উদ্ধৃতি আর ফুটনোট আর কুঞ্চিকার সাহায্যে জাহির করবার প্রয়োজন বোধ করেন না। যা বক্তব্যের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন

অথচ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তাকে প্রকট করে তুললেই যে রচনা উৎকর্ষ-মণ্ডিত হয় এমন ভ্রান্ত ধারণা অন্ততঃ কোন সৎলেখকের নেই।

বাংলা সাহিত্যের আর-একজন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখক—প্রমথ চৌধুরী। তিনিও শুষ্ক তথ্যের কারবারী ছিলেন না। রস এবং জ্ঞান উভয়ত্র তাঁর গতিবিধি ছিল এবং এ দুটি জিনিসই সমানভাবে তিনি তাঁর রচনায় পরিবেশন করে গেছেন। কিন্তু কোথাও তাঁকে যাকে বলে bare facts তার ব্যাখ্যানের শরণ নিতে হয় নি। আর কেনই বা নেবেন? তিনি তো অর্থনীতি, সমাজ-তত্ত্ব বা ইতিহাসের treatise লিখতে বসেন নি; তিনি সাহিত্য-প্রবন্ধকার, সাহিত্য-পরিবেশনের জন্যই লেখনী ধারণ করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতি হয়তো কিছু পরিমাণে ভঙ্গীদোষদুষ্ট, কিন্তু ওই ভঙ্গীর আশ্রয় তিনি নিয়েছিলেন সাহিত্যের প্রয়োজন অর্থাৎ আলঙ্কারিক-কথিত ব্যঙ্গ্যার্থ আর বক্রোক্তির প্রয়োজন মনে রেখেই, অন্যতর কোন উদ্দেশ্যে নয়। যদিও দৃষ্টিভঙ্গী আর রচনারীতির দিক্ দিয়ে মোহিতলাল মজুমদার আর প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য,—এই দুই ব্যক্তিত্বের ভিতর সাদৃশ্যলক্ষণ প্রায় কিছুই নেই বলতে গেলে—তবু খতিয়ে দেখতে গেলে, এক বিষয়ে বোধ হয় তাঁদের মধ্যে মিল ছিল। এঁদের দুজনাই গবেষণার বিরোধী ছিলেন। জ্ঞানের পরিধির বিস্তার সাধনে গবেষণার প্রয়োজন কে অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু এঁদের উভয়ের ভাবখানা সম্ভবতঃ এই ছিল যে, বিশুদ্ধ সাহিত্য নিয়ে যেখানে কথা, সে স্থলে গবেষণা-জাতীয় কর্মতৎপরতা অপরিহার্য নয়। গবেষণার স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আছে এবং সেখানে তার মূল্য অনস্বীকার্য ও বিশাল, তাই বলে তাকে বিশুদ্ধ সাহিত্যকর্মের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলে না। সাহিত্যের ক্ষেত্র আর গবেষণার ক্ষেত্র এক নয়। একের উপজীব্য সৃজনধর্মী আবেগ ও প্রেরণা; অপরের মস্তিষ্কজীবিতা, খুঁটিনাটির প্রতি সুতীক্ষ্ণ মনোযোগ, অধ্যবসায়। শেষোক্ত ধারার কর্ম সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মনে রীতিমত ভীতি ছিল। তিনি তাঁর "ভারতচন্দ্র" প্রবন্ধে খোলাখুলিই স্বীকার করে গেছেন যে, "ভগবান আমাকে কোন বিষয়ে গবেষণা করবার জন্য এ পৃথিবীতে পাঠান নি।" এ থেকে ওই বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকের মনের ধাতটুকু বুঝতে পারা যায়।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ-নিবন্ধ-লঘুপ্রবন্ধ-সমালোচনা-জাতীয় রচনা কিছু কম লেখা হচ্ছে না। সেগুলি সবই গ্রাহ্য নয়। সেই সব রচনাকেই মাত্র আমরা তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি যেগুলি উপরের বর্ণিত মানদণ্ডের

পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ। প্রবন্ধের সারকথা হওয়া চাই বক্তব্যের প্রাচুর্য ও গভীরতা এবং লিপির প্রাঞ্জলতা ও শিল্পসৌন্দর্য। প্রেরণায় এর ভিত্তি, যুক্তিতে এর বহিঃপ্রকাশ। মস্তিষ্ক এবং হৃদয় দুইই এখানে অপরিহার্য। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনে ততটুকু তথ্যনিষ্ঠাই স্বীকার্য, যতটুকু না হলে বক্তব্যের প্রতীতি-যোগ্যতা অন্ততঃ পাঠকমনে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব নয়। তা বলে ওই অজুহাতে তথ্যের পর তথ্য গেঁথে রচনাকে হাড়ের মালা বানিয়ে তোলার অর্থ হয় না। সাহিত্যসাধনা মৃন্ময়ের সাধনা নয়, চিন্ময়ের সাধনা।

বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে বহু গদ্য-লেখক ক্রিয়াশীল রয়েছেন। একেবারে যাঁরা বর্ষীয়ান তথা প্রবীণ পর্যায়ের লেখক তাঁদের কথা আপাততঃ ধরছি না, তবে যাঁরা সাম্প্রতিক সাহিত্যের সঙ্গে জীবন্ত যোগে যুক্ত আছেন তাঁদের একটা হিসাব নেওয়া যেতে পারে। এই প্রবন্ধের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মোটামুটি এই কজন লেখকের নাম আমরা উল্লেখযোগ্য মনে করতে পারি।—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, প্রবোধচন্দ্র সেন, নির্মলকুমার বসু, প্রমথনাথ বিশী, বুদ্ধদেব বসু, গোপাল হালদার, বিমলচন্দ্র সিংহ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সুবোধ ঘোষ, জগদীশ ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, শিবনারায়ণ রায়, অরবিন্দ পোদ্দার. রঞ্জন, হরপ্রসাদ মিত্র, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রথীন্দ্রনাথ রায়।

বাংলা উপন্যাসের চার পুরুষ

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের বয়ঃক্রম সবেমাত্র চার পুরুষের সীমা অতিক্রম করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি প্রথম পুরুষ বলা যায়, তা হলে রবীন্দ্রনাথ হলেন দ্বিতীয় পুরুষ, শরৎচন্দ্র হলেন তৃতীয় পুরুষের সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক এবং বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক-বনফুল হলেন চতুর্থ পুরুষের চারজন সেরা ঔপন্যাসিক। তারাশঙ্কর-বনফুলদের পরে এখন বাংলা সাহিত্যে যে ধারা চলেছে তাকে একটি স্বতন্ত্র পুরুষানুক্রম বলে গণ্য না করে চতুর্থ পুরুষেরই অনুক্রম বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনের এই পর্ববিভাগ মেনে নিলে দেখা যায়, বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতির পিছনে পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের ভাবাদর্শ, আঙ্গিক ও কলাকৃতির প্রভাব রয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসশিল্পের ধাঁচেই বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে, এ কথা বললে বিশেষ কিছু অন্যায় বলা হয় না এবং তাতে বাংলা উপন্যাসের মৌলিকতারও কিছু অপহ্নব সূচিত হয় না। কারণ বাংলা উপন্যাসের গঠন ও রূপসজ্জার পিছনে পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের প্রভাব বিদ্যমান থাকলেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, চিত্র-চরিত্রের নির্বাচনে বাংলার উপন্যাসকারেরা মোটেই পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের ধারাধরন অনুসরণ করেন নি, তাঁরা একান্তভাবে এ-দেশীয় মৃত্তিকা, আবহাওয়া ও মানুষকেই তাঁদের রচনার উপজীব্য করেছেন। বাঙালী উপন্যাসকারেরা বিদেশী সাহিত্য থেকে আঙ্গিক ধার করেছেন, প্রকরণের জ্ঞান আহরণ করেছেন, কিন্তু ঘটনার নির্মাণে ও চরিত্রের পরিস্ফুটনে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই স্বদেশীয় সংস্কারের পোষকতা করেছেন। এইজন্যই বাঙালী উপন্যাসকারদের আমরা খাঁটী বাঙালী উপন্যাসকাররূপে পেয়েছি, যদিও তাঁদের মনোজীবনের ভিতর কিছু পরিমাণে বিদেশী প্রভাব মিশে গিয়ে থাকবে।

যে চার পুরুষের উল্লেখ করা হল তাদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তাদের এই স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী এক এক পুরুষের উপন্যাসের প্রকৃতি এক এক ধরনের হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা ঐতিহাসিক রোমান্স-রসের আধিক্য দেখতে পাই। বাংলার সম্ভবিগত অতীত গৌরবকে কেন্দ্র করে এই অপরিসীম শক্তিধর লেখকের কাব্যকল্পনা স্ফূর্তিলাভ করেছে। যে সকল উপন্যাসে

তিনি ইতিহাসের আশ্রয় নেন নি সেই সব রচনায় সমসাময়িক সমাজের ঘটনা ও চরিত্রকে আশ্রয় করলেও এক গভীর আদর্শবাদী অভীপ্সার দ্বারা তিনি চালিত হয়েছেন। এসব রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর একজন সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসশিল্পকে কখনও নিছক সৌন্দর্যচর্চার আধার মনে করেন নি। কি ঐতিহাসিক রোমান্স-ধর্মী উপন্যাসে কি সামাজিক উপন্যাসে তিনি এক যুগ্ম দ্বৈত প্রবণতার দ্বারা চালিত হয়েছেন—গভীর সৌন্দর্যানুভূতি ও প্রগাঢ় সমাজকল্যাণবোধ তাঁর শিল্পিসত্তার ভিতর এক অখণ্ড সমন্বয়ে সমন্বিত হয়েছে। এ কথার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাঁর 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' উপন্যাস। এই তিনটি উপন্যাসের ভিতর বঙ্কিমচন্দ্র সদ্যকথিত যুগ্ম আদর্শকে সবচেয়ে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছেন। আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যে সৌন্দর্য-প্রাণতা ও বৃহত্তর সমাজবোধের শ্রেষ্ঠ উদাহরণস্থল হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিম-চন্দ্রের সামাজিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আজকের প্রবহমান ভাবাদর্শের মিল না থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ভিতর সমাজ-কল্যাণের যে তীব্র অভীপ্সা পরিলক্ষিত হয় উত্তরপুরুষের লেখকদের রচনায় সে জিনিসটি ঠিক পাওয়া যায় না। জাতিগঠনের চেতনা পরবর্তী লেখকদের মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবেই অনেকখানি পরিমাণে ক্ষীণ হয়ে এসেছিল।

বঙ্কিমের সময়কার সামাজিক জীবনের গঠন তাঁর উপন্যাসের উপর বিশেষ ছাপ ফেলেছিল, এটি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের সময় বাংলা দেশে যে সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা একান্তরূপে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। জমিদার শ্রেণীর প্রতাপ তখন এতই স্বতঃসিদ্ধ যে আর অন্য সকল শ্রেণীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা তখন ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না বললেও চলে। বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাঁর রচনায় তদানীন্তন কালের এই প্রবল সংস্কারের পোষকতা করেছিলেন। সেই কারণে দেখতে পাই, উপন্যাসের পটভূমি নির্বাচনে যেমন তিনি একদিকে গ্রামজীবনকে সবিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে চরিত্রসৃষ্টিতে গ্রামের জমিদার তথা অভিজাত সম্প্রদায়কেই বেছে নিয়েছিলেন। গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ, প্রতাপ, মহেন্দ্র, ব্রজেশ্বর সকলেই জমিদার শ্রেণীর মানুষ। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতেও তেমনি সামন্ত রাজাদের আধিপত্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় এর ব্যতিক্রম আশা করা যায় না। আমাদের সমাজ ও

রাষ্ট্রজীবন যেমন একটি সুনির্দিষ্ট বিবর্তনের ক্রম অনুসরণ করে পরিবর্তনের পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে, প্রথমে রাজতন্ত্র, রাজতন্ত্রের পর সামন্ততন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের পর ধনকৌলীন্যবাদ, ধনকৌলীন্যের আনুষঙ্গিক হিসাবে গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের পর সমাজবাদ—তেমনি শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বেলায়ও মোটামুটি এই ক্রমেরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে আমাদের দেশে অন্যান্য শ্রেণী তো পরের কথা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই ভাল করে জাগরণ হয় নি। কিংবা, ইংরেজ শাসনের আওতায় নগরনিবদ্ধ বৃত্তিজীবী শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবেমাত্র জাগরণ হতে আরম্ভ করেছে। এই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে উপন্যাসের চিত্র-চরিত্র নির্বাচনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সম্যক্ মর্যাদা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি সে চেষ্টা করেনও নি। তিনি প্রায় ষোল-আনাই তাঁর চরিত্র গ্রামীণ জীবনের উচ্চ স্তর অর্থাৎ অভিজাত স্তর থেকে আহরণ করে-ছিলেন। সত্য বটে ব্রিটিশ আমলে যে প্রবল জাতীয়তাবাদী অভীপ্সার সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম এবং যে জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ারের তরঙ্গশীর্ষে বাঙালী মধ্যবিত্তের জাগরণ, সেই জাতীয়তাবাদের বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উদ্গাতা, তা হলেও উপন্যাসের চরিত্র নির্বাচনে বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আমল দেন নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণী মূলতঃ বৃত্তিজীবী, আর এই বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্তের অধিষ্ঠান শহরে। নগরজীবন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আদৌ রূপায়িত হয় নি। নগরই যখন অনুপস্থিত, সে স্থলে মধ্যবিত্তের চিত্রায়ণ প্রত্যাশা করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের পটভূমি নির্বাচনে গ্রামীণ জীবনকে তাদৃশ প্রাধান্য দেন নি। বরং বলা যেতে পারে, এ ব্যাপারে শহরের উপরেই যেন তাঁর সমধিক পক্ষপাত। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে অবশ্য তিনি ষোল-আনার উপর সতেরো-আনা গ্রামকেই আশ্রয় করেছেন, কিন্তু উপন্যাসে তার বিপরীতা-চারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস মূলতঃ নগরকেন্দ্রিক। 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়' সব কটির কাহিনীই শহরের পটভূমির উপর বিস্তৃত। মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে 'ঘরে-বাইরে' ও 'যোগাযোগ' উপন্যাস। ও দুটি রচনাকর্মের ভিতর না-শহর-না-গ্রাম-রূপ এক নির্বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশ জায়গা জুড়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচিত 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট'

ও 'রাজর্ষি' উপন্যাসের কথা অবশ্য আলাদা। সেখানে সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া চারিদিক ব্যাপ্ত করে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তিনি নিজে অভিজাত শ্রেণীসম্ভূত হওয়ায় সামন্ততান্ত্রিক রীতিপদ্ধতির সহিত আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িত অভিজাত শ্রেণীর প্রতিই তাঁর প্রাথমিক পক্ষপাত ন্যস্ত হয়েছিল, কিন্তু পরে তাঁর শৈল্পিক দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটে। সামন্ততান্ত্রিক চিত্র ও চরিত্র অঙ্কনের মোহ তাঁর কেটে যায়। তিনি তাঁর শিল্পদৃষ্টিকে নগরের সীমার মধ্যে নিয়ে আসেন।

তবে রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নগরকেন্দ্রিক হলেও নগরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি দৃক্‌পাত করার তাদৃশ অবকাশ তিনি পান নি। বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনসংগ্রাম কিংবা জীবনযাপনরীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। কাজেই উপন্যাসের চরিত্র সংকলনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেণীগত পক্ষপাতী প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চ মধ্যবিত্ত স্তরের মানুষকেই চিত্রিত করেছেন। 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র, বিহারী থেকে শুরু করে 'নৌকাডুবি'র রমেশ, নলিনাক্ষ, হেমনলিনী ; 'গোরা'র গোরা, সুচরিতা ; 'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশ, 'যোগাযোগে'র মধুসূদন, 'শেষের কবিতা'র অমিট রায়ে, 'দুই বোন'-এর শশাঙ্ক, 'মালঞ্চে'র আদিত্য সকলেই উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। এর মধ্যে নিখিলেশ ও মধুসূদন তো রীতিমত জমিদার। এই শ্রেণীর মানুষের প্রতি সমধিক মনোযোগ আরোপিত হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার দৃষ্টিসীমায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরের বাঙালী জীবন ধরা পড়ে নি। এর ভাল-মন্দ দুই রকম ফলই হয়েছে। একদিকে আমরা রবীন্দ্র-উপন্যাসের ভিতর রূঢ় বাস্তবের কটুস্বাদ তিক্ততা থেকে নিষ্কৃতি পাই, নিষ্কৃতি পেয়ে মানসিক স্বস্তি লাভ করি ; অন্যদিকে ঠিক এই কারণের জন্যই আমাদের প্রত্যাশা কিছু পরিমাণে অপূর্ণও থেকে যায়। যে উপন্যাসের কাহিনীর ভিতর মানুষের মৌলিক জীবনসংগ্রামের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় উচ্চাবচ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না, প্রেমই যে রচনার মুখ্য উপজীব্য, সে-জাতীয় উপন্যাস উচ্চাভিপ্রায় এবং তদনুরূপ লিপিনৈপুণ্য সত্ত্বে কতকটা রোমান্সধর্মী না হয়েই পারে না। তার ভিতর স্বপ্নালুতা যে-পরিমাণ থাকে, ভাবাবেগ যে-পরিমাণ থাকে, বাস্তবচেতনা তাদৃশ পরিমাণে থাকে না। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব কটি উপন্যাস সম্পর্কে এই মন্তব্য খাটে, ব্যতিক্রম শুধু 'গোরা'।

রবীন্দ্র-উপন্যাসে স্বপ্নিলতা ও প্রেমানুভূতির আধিক্যের পিছনে সাধারণ বাংলা উপন্যাসের বদ্ধমূল রোমান্স-প্রবণতা ছাড়াও অন্য কারণ আছে। এ কথা ভুললে চলবে না যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথমতঃ কবি, তারপর অন্য-কিছু। কবিধর্মিতার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কি পদ্য কি গদ্য সকল রচনা অনুপ্রাণিত। ঘটনার পরিকল্পনায়, চরিত্রের রূপায়ণে, কাহিনীর বিন্যাসে সর্বত্র এক অসাধারণ কবিমনের সংবেদনশীলতা সুগুপ্ত রয়েছে। পাঠকদের মধ্যে যাঁদের মন স্বভাবতঃ কাব্যমুখী, তাঁরা 'ঘরে-বাইরে' ও 'শেষের কবিতা' পড়ে আশ্চর্য আস্বাদ পাবেন, 'চোখের বালি,' 'নৌকাডুবি' আর 'গোরা'র প্রেমচিত্রণ তাঁদের দুর্নিবার ভাবে আকর্ষণ করবে ; কিন্তু এ কথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, সামগ্রিক ভাবে বিচার করতে গেলে রবীন্দ্র-উপন্যাসের মধ্যে সমাজ-বাস্তবতার উপাদান খুব বেশী নেই। বঙ্কিমচন্দ্রও রোমান্স লিখেছেন সত্য, কিন্তু সেই রোমান্সের মধ্যেই সমাজকল্যাণকে তিনি দক্ষ শিল্পীর ন্যায় আশ্চর্য কৌশলে গ্রথিত করেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে যেমন উচ্চ কাব্যসৌন্দর্য আছে তেমনি সমাজ-কল্যাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত মনীষার খরদ্যুতিও আছে। দুইয়ের মধ্যে সেখানে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথে এ সমন্বয় দেখতে পাই না। তাঁর কল্পনার তৌলদণ্ড কাব্যপ্রাণতার অভিমুখে বড় বেশী ঝুঁকে পড়েছে। সামাজিক অভিপ্রায় তার প্রাপ্য মর্যাদা সেখানে লাভ করে নি। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস অন্য সব গুণ থাকা সত্ত্বেও কেমন যেন হাল্কা মনে হয়। শেষের দিকের রচনায় এই চটুলতা না কমে বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল।

'গোরা' উপন্যাসকে এ-সবের ব্যতিক্রম মনে করবার কারণ, 'গোরা'র ভিতর সৌন্দর্যের উপাদান ও মননশীলতা দুই এক নিগূঢ় সামঞ্জস্যের মধ্যে মহান্ ঐক্য লাভ করেছে। এই একটি মাত্র উপন্যাস, যার ভিতর রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার পাশাপাশি তাঁর মনস্বী সত্তার সঙ্গেও আমরা পরিচিত হই। বৃহদায়তন গোরা উপন্যাসে যেমন নানা শাখাপ্রশাখাযুক্ত একটি চমৎকার কাহিনী আছে, তেমনি তার অন্তরালে একটি উচ্চ ভাবাদর্শও ক্রিয়াশীল রয়েছে। বহু বিচিত্র চিন্তাপূর্ণ আলোচনা, বিচ্ছিন্ন বা এলোমেলো ভাবে নয় উদ্দেশ্যের পরিপূরক রূপে, এই গ্রন্থের কাহিনীর ভিতর সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এবং, যা আরও বড় কথা, তা করা হয়েছে উপন্যাসের শিল্পরূপের হানি না ঘটিয়ে। 'গোরা'র রীতি অনুসরণ করে পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসখানা রচিত হয়েছিল, কিন্তু সেখানে উপন্যাসের শিল্পগত সংহতিকে

ছাড়িয়ে আলোচনা আলোচনা হিসাবেই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'গোরা' উপন্যাসে এমনটি ঘটতে পারে নি। সেখানে রচনার আদর্শগত অভিপ্রায় ও রচনার শিল্পসৌন্দর্য অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে।

'গোরা' উপন্যাসের আদর্শগত অভিপ্রায় হল সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের অসারতা প্রতিপাদন। উপন্যাসের মূল চরিত্র গোরার মধ্যে যে উৎকট হিঁদুয়ানির ততোধিক উৎকট প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, তার গোটা বুনিয়াদটাই একটা প্রচণ্ড শূন্যগর্ভ প্রত্যয়ের চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে আছে। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে না পৌঁছনো পর্যন্ত প্রকৃত সত্যের সন্ধান আমরা পাই না। যেদিন গোরা আনন্দময়ীর কাছ থেকে তার জন্মরহস্য অবগত হল, এক মুহূর্তে তার এতদিনের সযত্নরচিত উগ্র বিশ্বাসের প্রাকার তাসের ঘরের মত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সেই সঙ্গে তীব্রগন্ধী জাতীয়তার রসে ভিজে আসা পাঠকের মনও প্রচণ্ড একটা নাড়া খেল। যে সংস্কারের ভিত্তিভূমির উপর পাঠক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, তা তাঁর পায়ের তলা থেকে সরে যাবার উপক্রম হল। পাঠকের মনে এমনতর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার ধাক্কা দেবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতনতার সহিত প্রথমাবধি উপন্যাসটির পরিকল্পনা ওইভাবে করেছিলেন। তিনি এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে একটি বাণী বা message ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন—সে বাণী উদার আন্তর্জাতিকতার বাণী, বিশ্ব-সৌভ্রাত্রের বাণী, যুযুধান সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার সমাধিভূমির উপর শান্তিপূর্ণ বিশ্বৈকাত্মবোধ গড়ে তোলার বাণী। তন্মুহূর্তে বাঙালীর সমক্ষে ওই বাণী প্রচারের প্রয়োজন ছিল।

'গোরা' উপন্যাস ১৯১৩ সনে রচিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের অধ্যায় ও শান্তিনিকেতনে উদার বিশ্বমৈত্রী ও আন্তর্জাতিকতার প্রতীক বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়ের কথা। পাঠক অবগত আছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর মন এই আন্দোলনের রীতি-পদ্ধতির উপর বিমুখ হয়ে উঠতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর মনে দ্বিধা ছিল না, কিন্তু সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য দেশবাসী যে উগ্র জাতীয়তাবাদী জিগির প্রচারের পথ গ্রহণ করেছিল তার প্রতি তাঁর চিত্তের সায় ছিল না। তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংগ্রামশীল মনোবৃত্তির অতিরিক্ত যুযুধান প্রকাশকে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি, যদিও পশ্চাদ্‌ভাবনার দ্বারা

এবং এদেশে ইংরেজ-ভারতীয়ের সম্পর্ক বিবেচনা করে আমরা বুঝতে পারি, সেই সময়ে জাতীয়তার এবংবিধ তীব্র অভিব্যক্তি স্বাভাবিক ছিল। চিরসত্যের উপাসক রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার খণ্ড-সত্যে আশ্রয় না পেয়ে ক্রমে ক্রমে অথচ সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বভ্রাতৃত্বের উদার আদর্শের অভিমুখে ঝুঁকেছিলেন। বিবর্তনের পথে অগ্রসরমাণ সেই পরিবর্তিত মানসেরই শৈল্পিক অভিব্যক্তি আমরা খুঁজে পাই 'গোরা' উপন্যাসে। 'গোরায়' শিল্পানুভূতি এবং প্রজ্ঞা—উপন্যাসের এই দুই অপরিহার্য মৌলিক উপকরণ—সার্থক সমন্বয়ে সমন্বিত হয়েছে। 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। অবশ্য চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের একটি লেখা থেকে জানতে পারি, রবীন্দ্রনাথের নিজের পক্ষপাত ছিল 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটির উপর।

সুনিপুণ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রে এসে আমরা দেখতে পাই, শরৎচন্দ্র উপন্যাস-শিল্পের প্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথ কারও পথই পূরাপূরি গ্রহণ করেন নি। তিনি কাহিনী-গ্রন্থন ও সংলাপ-রচনার একটি নিজস্ব পথ উদ্ভাবন করে নিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের গল্প-বলার একটা স্বকীয় ঢঙ ছিল। শরৎচন্দ্র যদিও স্বমুখে স্বীকার করেছেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসপাঠের দ্বারা কৈশোরে ও যৌবনে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, কিন্তু উভয়ের প্রকৃতিতে মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ কবি ও দ্রষ্টা; শরৎচন্দ্র সংসারজীবনের বিবিধ বৈচিত্র্যের পর্যবেক্ষক শিল্পী। রবীন্দ্রনাথে প্রকৃতি ও প্রেমের উৎকর্ষ; পক্ষান্তরে, মানুষই শরৎচন্দ্রের মনোযোগের কেন্দ্রভূমিতে অধিষ্ঠিত—ভালয়-মন্দে মেশানো মানুষ, জৈব জীবনের সীমায় আবদ্ধ মানুষ, জীবনের পথে চলা সাধারণ গড়পরতা মানুষ। দুইয়ের মনোভঙ্গীর এই মৌল পার্থক্যের জন্য তাঁদের উপন্যাসের প্রকৃতিরও মৌল পার্থক্য ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আর একটি পার্থক্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে অভিজাত ও ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় থেকে তাঁর প্রধান চরিত্রগুলি আহরণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ যেখানে নাগরিক অভিজাত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর চরিত্র সন্ধান করেছেন, শরৎচন্দ্র সেস্থলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষগুলিকেই টেনে এনেছেন সাহিত্যের পাতায়। সাহিত্যে এই শ্রেণীর মানুষের জীবনচিত্রণ শরৎচন্দ্রের পূর্বে অভাবিত ছিল। লেখকের শ্রেণীস্বরূপ

যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির উপরও অজানিতে প্রভাব বিস্তার করে তা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের শ্রেণীস্বরূপ ও তাঁদের উপন্যাসের প্রকৃতি বিচার করলেই আমরা বুঝতে পারি। শরৎচন্দ্র সাধারণ জীবনের স্তর থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন, সেই কারণে তাঁর রচনায় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার কাহিনীই মূলতঃ রূপায়িত হয়েছে। তিনি যদি অভিজাত স্তরের সন্তান হতেন তা হলে এরকমটি হত কিনা সন্দেহ। অবশ্য পরবর্তীকালীন কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের মত তিনি যদিও নির্যাতিত-অবহেলিত সমাজের প্রতীক শ্রমিক-কৃষকের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তেমন ভাবে তাঁর সাহিত্যে ভাষা দিয়ে যেতে পারেন নি, তা হলেও এ কথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে তাঁর রচনায়ই প্রথম শিল্পী-মানসের ওইরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। গণজীবনের দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে কখনও 'মহেশ'-এর মত অসাধারণ গল্প সৃষ্টি করা যায় না। শরৎচন্দ্র তাঁর চরিত্রগুলিকে প্রধানতঃ গ্রামজীবন থেকে সংগ্রহ করেছেন। এটিও বাংলা দেশের মৌলিক প্রকৃতির সঙ্গে লেখকের নিবিড় আত্মীয়তার পরিচায়ক। বাংলা দেশ, সমগ্র ভারতবর্ষের মত, এখনও গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামেই তার প্রাণ। আজ হয়তো স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পরিবর্তিত অবস্থার জন্য গ্রামের চেহারা দ্রুত পালটে যাচ্ছে এবং পল্লীকে 'শহর বানিয়ে তোলার একটা প্রচণ্ড হিড়িকের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের সময়ে বাংলার গ্রাম সেই সনাতন গ্রামই ছিল। শরৎচন্দ্র পল্লীর সন্তান। পল্লীকে তিনি খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে পল্লীর দুঃখ-বেদনাময় অন্তরঙ্গ রূপটি তাঁর লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। স্বয়ং পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখের অংশভাক্ না হলে কোন শিল্পী পল্লীর এমন বাস্তব জীবন্ত রূপ তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন না।

তাই বলে এ কথা মনে করা অযৌক্তিক হবে যে, শরৎচন্দ্র শিল্পবোধের ক্ষেত্রেও গ্রামীণ সংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। মোটেই তা দেন নি। অশিক্ষিত-পটুত্বের আদর্শের উপর তাঁর কোন আস্থা ছিল না। তিনি অতিশয় সচেতন স্তরের শিল্পী ছিলেন। তিনি গ্রামজীবনের অবলম্বনে তাঁর চিত্র-চরিত্র রচনা করেছেন সত্য কথা, কিন্তু রচনারীতির বেলায় নাগরিকতা ও বৈদগ্ধ্যকে একান্তরূপে আশ্রয় করেছিলেন। প্রতিটি কথা গল্পে ও উপন্যাসে তিনি মেপে-মেপে বসিয়েছেন। শব্দপ্রয়োগে ও বাক্যগঠনে তিনি প্রথম শ্রেণীর একজন সজ্ঞান মণিকারের মত গ্রহণ-বর্জন-নির্বাচন প্রক্রিয়ানুসারে কেবলমাত্র

সেরা মণিগুলিকেই গেঁথে তুলেছেন তাঁর অলঙ্কার নির্মাণের কাজে। শরৎচন্দ্রের বর্ণনা ও সংলাপ শ্রেষ্ঠ কলাকুশলতার নিদর্শন। এমন নিপুণ গল্পকার অর্থাৎ গল্পকথনের ক্ষমতাবিশিষ্ট লেখক বাংলায় আর দ্বিতীয় আবির্ভূত হন নি। গল্প বলার তাঁর এই-যে বিশিষ্ট নৈপুণ্য, এর মূলে ছিল তাঁর অতি-সজাগ শিল্পী মন। এই সজাগতা নাগরিকতার লক্ষণ; গ্রামীণতায় এর মূল খুঁজে পাওয়া যায় না। 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত', 'দত্তা' 'গৃহদাহ' প্রভৃতি যে কোন উপন্যাসের আরম্ভের কয়েকটি পংক্তি অনুধাবন করলেই দেখা যাবে, কাহিনী নির্মাণের এক বিশেষ জাদুকৌশল নিয়ে শরৎচন্দ্র সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন—এমনতর জাদু আর কারও জানা ছিল না। শরৎচন্দ্র যদিও যাকে বলে intellectual লেখক তা ছিলেন না, কিন্তু ভাষা-শিল্পের বেলায় তিনি সবিশেষ intellectual প্রবণতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর মনন-শীলতা স্টাইলের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছে; বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত ভাবাদর্শের প্রচারে বিশেষ স্ফূর্তিলাভ করে নি। শরৎচন্দ্র যত না ভাব (idea)-সচেতন ছিলেন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী ছিলেন ভাষা-সচেতন। তাঁর গল্পকথননৈপুণ্যের মূল এইখানেই প্রোথিত।

শরৎচন্দ্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীল প্রজ্ঞা ছিল না, কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিরও তিনি অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু একটি মস্ত বড় সম্পদে তাঁর অন্যবিধ অপূর্ণতার পূরণ হয়েছিল। তাঁর ভিতর অপরিমেয় বেদনাবোধ ছিল। গভীর সহানুভূতির দ্বারা সাধারণ মানুষের জীবনের গহনে প্রবেশ করে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। আর সেই কারণেই সকল স্তরের পাঠকের উপর তাঁর রচনার আবেদন এত ব্যাপক ও প্রবল হতে পেরেছিল। শরৎচন্দ্র অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের স্তরে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় উচ্চ আদর্শবাদ-প্রণোদিত সমাজগঠনের আদর্শ প্রচার করেন নি, সে সামর্থ্যও তাঁর ছিল না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে তিনি বাংলার সমাজগঠনের কাজ কিছুটা করে গিয়েছেন। তাঁর রচনার হৃদয়গ্রাহিতা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে, সেই প্রবল আবেদনময়তা ও জনপ্রিয়তার সাহায্যে তিনি বাঙালী পাঠকের মনোজীবনকে প্রভাবিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তত্ত্বাদর্শের প্রচারণার দ্বারা যে কাজ সিদ্ধ করতে চেয়েছেন, শরৎচন্দ্র সে কাজ সিদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন গভীর হৃদয়সংবেদনপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা। শরৎচন্দ্রের ও তৎপরবর্তী যুগের পাঠকের মনোভঙ্গী শরৎ-সাহিত্য পাঠের দ্বারা দৃষ্টি-

গ্রাহ্যভাবে প্রভাবিত হয়েছে। বাঙালী মনে শরৎচন্দ্র একাধিক কুসংস্কারের জড় দুর্বল করেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। এ যুগে বাঙালীর রুচি ও সৌন্দর্যানুভূতি সংস্কৃত হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের দ্বারা, তার মানসিক প্রবণতা গড়ে উঠছে শরৎ-সাহিত্যের খাত-বেয়ে-আসা ভাবুকতার অবলম্বনে। শরৎচন্দ্রের সুরেন্দ্র (বড়দিদি), দেবদাস (দেবদাস), রমেশ (পল্লীসমাজ), অতুল (অরক্ষণীয়া), ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, জহর (শ্রীকান্ত), মহিম, সুরেশ (গৃহদাহ), নরেন (দত্তা), সতীশ, উপীনদা (চরিত্রহীন), বৃন্দাবন (পণ্ডিতমশাই), গোকুল (বৈকুণ্ঠের উইল), সব্যসাচী, অপূর্ব (পথের দাবী), বিপ্রদাস, দ্বিজদাস (বিপ্রদাস) ইত্যাদি বিভিন্ন চরিত্রের প্রভাব আজকের অপ্রবীণবয়সী ও যুব সমাজের মনোগঠনের মধ্যে জড়াজড়ি করে রয়েছে। ব্যক্তিগত প্রবণতাভেদে কোথাও উল্লিখিত চরিত্রগুলির মধ্যে একটির প্রভাব বেশী পড়েছে, কোথাও অন্যটির। তেমনি বিরাজ (বিরাজ বৌ), মাধবী (বড়দিদি) জ্ঞানদা (অরক্ষণীয়া), রমা, জ্যেঠাইমা (পল্লীসমাজ), অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, সুনন্দা, কমললতা (শ্রীকান্ত), বিজয়া (দত্তা), সুরবালা, সরোজিনী, সাবিত্রী, কিরণময়ী (চরিত্রহীন), অচলা (গৃহদাহ), ভারতী, সুমিত্রা (পথের দাবী), ষোড়শী (দেনা-পাওনা), কমল (শেষ প্রশ্ন), বন্দনা (বিপ্রদাস), বিন্দু (বিন্দুর ছেলে), নারায়ণী (রামের সুমতি) প্রভৃতি শরৎসৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের সম্মিলিত প্রভাব গিয়ে পড়েছে একালীন নারীসমাজের মধ্যে। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত স্তরের নারীদের মধ্যে এই প্রভাব খুবই বেশী। আধুনিক বাঙালী নারীর সেবাপরায়ণতা, সামাজিকতা, স্নেহমমতার অভিব্যক্তি, সন্তানবাৎসল্য, বিদ্রোহের মনোভাব, আত্মত্যাগ, প্রেমাকুলতা প্রভৃতি বিচিত্র মনোবৃত্তি যে শরৎ-সাহিত্য পঠন-পাঠনের দ্বারা অনেকখানি পরিমাণে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সে বিষয়ে আদৌ সংশয়ের অবকাশ নেই। এমন কি, স্কুলে-কলেজে পড়া মেয়েদের সংলাপ এবং রচনার ভাষাও যে শরৎচন্দ্রের গল্পোপন্যাসের সংলাপের ঢঙে গঠিত হয়েছে সে কথা বললেও বিশেষ বাড়িয়ে বলা হয় না। শরৎচন্দ্র গভীর তত্ত্বাশ্রয়ী উদ্দেশ্যমূলকতার ধার দিয়ে না গিয়েও পরোক্ষভাবে কিন্তু অবলীলাক্রমে একালীন বাঙালীর মনোভঙ্গীকে বেশ কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করেছেন এ তাঁর পক্ষে বড় কম কথা নয়।

এই খাতে শরৎচন্দ্রের প্রভাব অবশ্য সবটাই সুফলের কারক হয় নি, সেই প্রভাবের মধ্যে বেশ কিছুটা ভাবালুতা ও অভিপ্রায়হীনতা (আদর্শবাদী

অর্থে) মিশে আছেঃ নরনারীর হৃদয়গত সম্পর্কের চিত্রণটাই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অতিরিক্ত জায়গা জুড়ে আছে, তাদের জীবনের কর্মময় সংগ্রামের রূপ তাতে সবিশেষ প্রতিফলিত হয় নি, চরিত্রের ঋজুতা বলিষ্ঠতা শৌর্যবীর্য দৃঢ়তা এ সব গুণ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়কের মধ্যে আশা করলে বিফল হতে হবে। অবশ্য ইন্দ্রনাথ, উপীনদা, সব্যসাচী, রাজেনের মত ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু তারা ব্যতিক্রম রূপেই গণনীয়। শরৎ-সাহিত্যে জীবনের নমনীয়তা ও কমনীয়তার দিক্ যত প্রতিভাত, সাংগ্রামিকতার দিক্ তার সিকির সিকিও নয়। তবু এত সব বলা সত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, শরৎ-সাহিত্য সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের বাঙালীর মনোভঙ্গীকে কোন কোন দিক্ দিয়ে কল্যাণকর ভাবে প্রভাবিত করেছে। অন্ততঃ শরৎচন্দ্র অনেক অসার সংস্কারের মূলে সজোরে আঘাত হেনেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাঙালীর উপর শরৎচন্দ্রের প্রভাব হৃদয়ের খাত বেয়ে বিস্তৃত হয়েছে, মস্তিষ্কের প্রভাব পড়েছে কম। সাহিত্যপাঠজনিত রসোপভোগের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও শরৎচন্দ্রের নিকট বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞ হবার কারণ আছে।

শরৎচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন চারজন—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বনফুল' ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ গ্রামীণ প্রকৃতির কোলে মানুষকে স্থাপন করে তার অন্তর্নিহিত সারল্য, প্রকৃতিপ্রেম ও স্নেহপিপাসাকে রূপ দিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে, বিশেষতঃ 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-য়। বিভূতিভূষণের দৃষ্টি সহজাত কবিদৃষ্টি, এই কবিদৃষ্টির প্রসাদে তিনি নিশ্চিন্দিপুরের মত একটি তুচ্ছ এঁদো গ্রামকেও অপূর্ব মহিমায় ভূষিত করতে পেরেছেন। তা বলে তিনি আদৌ বাস্তববাদী ছিলেন না এ কথা বলা ভুল হবে। তাঁর কবিস্বপ্নের অন্তরালে একটি দৃঢ়-কঠিন বাস্তবতার পশ্চাৎপট ছিল। তিনি পল্লীর যে দারিদ্র্যের রূপ অঙ্কন করেছেন তা একান্ত-ভাবেই 'রিয়াল'। ওটি শুধু অপুদের সংসারেরই খণ্ড-সত্য নয়, সমগ্রভাবে গ্রামীণ জীবনেরও সত্য। সত্য বটে তিনি সমকালীন জীবনের নানাবিধ জটিল সমস্যা সম্বন্ধে তেমন মাথা ঘামান নি, এ যুগের চিন্তার আন্দোলনগুলি সম্পর্কে তাঁর মধ্যে তেমন সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় না, তাঁর মননের

ভঙ্গীর মধ্যে প্রশ্ন, প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের আঁকাবাঁকা গতিবেগের প্রভাব খুবই কম; তাই বলে তিনি পলায়নবাদের বিবরে আশ্রয় নিয়ে কল্পিত এক স্বপ্নজগতে প্রয়াণ করেন নি। অতীতাশ্রয়ী রোমান্সেও তাঁর মন কোনরূপ নির্ভরতার আশ্বাস বা স্ফূর্তি পায় নি। তিনি গ্রামকে পাঠকের চোখের সামনে একান্ত সত্য করে তুলেছিলেন। এ গ্রাম অবশ্য শরৎচন্দ্রের চোখে-দেখা গ্রাম নয়; এ গ্রাম বিভূতিভূষণের কবিস্বপ্ন ও বাস্তববোধের সমন্বয়প্রসূত এক নবতর গ্রাম। বিভূতিভূষণের গ্রামচিত্রণের মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। তাতে শুধু বাংলা দেশের গ্রামজীবনের লৌকিক রূপটিই ধরা পড়ে নি, সেই সঙ্গে প্রকৃতির বহুবর্ণদ্যুতিময় মণিখণ্ডের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত বাংলার গ্রামের চিরন্তন রূপটিও প্রতিভাত হয়েছে। বিভূতিভূষণ একই কালে স্বপ্নদ্রষ্টা ও বাস্তববাদী; তবে তাঁর বাস্তববাদের উপর নাগরিকতার তথা আধুনিক সমাজচেতনার ছাপ পড়ে নি সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

তারাশঙ্কর বিপরীত প্রকৃতির শিল্পী। বিভূতিভূষণের মত গ্রামকেই যদিও তিনি তার মূল উপজীব্য করেছেন, কিন্তু গ্রামীণ প্রকৃতি বা পরিবেশ তাঁর রচনায় বড় হয়ে ওঠে নি, বড় হয়ে উঠেছে মানুষ। তারাশঙ্কর হাজারো চরিত্রের মানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। তিনি প্রকৃতির কবি নন, মানুষের কবি। সে মানুষও আবার প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায় লালিত সরলচিত্ত আদুরে সাদাসিধা মানুষ নয়, জটিল মানুষ—পাপপুণ্য-শুভাশুভবোধের আলোছায়াময় মিশ্র সত্তাযুক্ত মানুষ। তারাশঙ্করের উপন্যাসে রকমারি চরিত্র—বিচিত্র তাদের মননক্রিয়া। মানুষ নামক জীবটিকে তিনি একমেটে করে গড়েন নি, তার স্বভাবের ও মননের একাধিক স্তর প্রদর্শন করেছেন। শরৎচন্দ্রের পল্লী-কাহিনীগুলিতে যে ধরনের কুটিল, কুচক্রী, সংস্কারাবদ্ধ চরিত্রের (যেমন বেণী গাঙ্গুলী, শিরোমণি, তর্করত্ন প্রভৃতি) সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তারাশঙ্করে অবশ্য সে-জাতীয় মানুষের তেমন দেখা মেলে না, তবে তাঁর রচিত চরিত্রগুলির মধ্যে বঙ্কিম মনের আঁকাবাঁকা খেলা অতি স্পষ্ট। তারাশঙ্কর মানুষের বিচিত্র মননক্রিয়ার জটিল-গহন অন্ধকারের অতলে অবতরণ করে মানবীয় স্বভাবের স্বরূপটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'কবি', 'কালিন্দী', 'তামস-তপস্যা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'অভিযাত্রী', 'বিচারক' প্রভৃতি উপন্যাস ও একাধিক গল্প এ কথার যাথার্থ্য বহন করে। মানবস্বভাবের মিশ্র প্রবণতার

বিশ্লেষণে তথা মানবীয় সত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তারাশঙ্কর পাশ্চাত্ত্যের সেরা লেখকদের সঙ্গে সমস্তরে না হলেও সমভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর রচনার প্রকৃতিকে আমরা ডস্টয়েভ্‌স্কী ও টলস্টয়ের রচনার প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যদিও মানসিক প্রস্তুতির দিক্ দিয়ে শেষোক্ত দুজন লেখক তাঁর তুলনায় অনেক বড়। শেক্‌স্‌পীয়্যরের চরিত্রচিত্রণের খানিকটা আদলও তারাশঙ্করের রচনায় দেখতে পাওয়া যায়।

তবে সত্যের খাতিরে এ কথা বলা ভাল, তারাশঙ্কর আজ পর্যন্ত এমন কোন চরিত্র সৃষ্টি করতে সমর্থ হন নি, যে চরিত্র মনকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে, তাকে চেতনার উচ্চগ্রামে উন্নীত করে। 'ধাত্রীদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে'র মূল চরিত্র শিবনাথ ও দেবু ঘোষ এবং 'সন্দীপন পাঠশালা'র বৃন্দাবন ও 'আরোগ্য-নিকেতন'-এর জীবন মহাশয় অবশ্য এই দিক্ দিয়ে কিছু কৃতিত্ব দাবি করতে পারে, কিন্তু যে অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ বা সত্যানন্দ কিংবা রবীন্দ্রনাথের গোরা পাঠকের চিত্তকে নিবিড় আদর্শবাদী অভীপ্সায় ভরিয়ে তোলে, তেমনভাবে কি তারাশঙ্করের কোন চরিত্রই মনের মূল ধরে নাড়া দেয়? বরং সেই দিক্ থেকে তারাশঙ্করের 'বিচারক' ও 'সপ্তপদী' গল্পের নায়কদ্বয় আমাকে অনেক বেশী অভিভূত করেছে, সে কথা স্বীকার করব। তারাশঙ্করের নির্মিত চরিত্রের মধ্যে ঋজুতা আছে কাঠিন্য আছে, কিন্তু মহতী প্রণোদনার সার্থক উজ্জীবন নেই।

'বনফুল' রচনারীতি ও আঙ্গিকের উৎকর্ষের দিক্ দিয়ে একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। চরিত্রসৃষ্টিতে তিনিও গভীর মানবস্বভাবজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'সপ্তর্ষি', 'রাত্রি,' 'জঙ্গম' প্রভৃতি বই উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি। তবে লেখকের মনোগঠনের ভিতর শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি ও মমতা, তারাশঙ্করের উদার মানবপ্রীতি মোটামুটি ভাবে অনুপস্থিত। সেই কারণে 'বনফুলের' রচনা মস্তিষ্কের প্রত্যাশা যতটা পূরণ করে, হৃদয়ের প্রত্যাশা বোধ হয় তেমন পূরণ করে না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সম্পর্কে আমি ক্ষেত্রান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।* এখানে পুনরুক্তি করতে চাই না। তবে প্রবন্ধের পূর্ণাঙ্গতার জন্য দু'চার কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

---

* লেখকের 'সমকালীন সাহিত্য' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিমান কিন্তু সবচেয়ে শক্তির অপপ্রয়োগকারী লেখক। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিধির ভিতর তাঁর তুল্য মনোবিশ্লেষণের ক্ষমতা কারও ছিল না। কিন্তু ওই ক্ষমতার মধ্যেই তাঁর দুর্বলতার বীজ নিহিত ছিল। মনোবিশ্লেষণ তাঁর নিকট ব্যসনে পরিণত হয়েছিল বললেও চলে। মানুষের মনের অন্ধকার গলিঘুঁজিতে পথ হাতড়ে চলবার নেশায় তিনি এমনই একদেশদর্শী হয়ে পড়েছিলেন যে, বহির্জগত তাঁর দৃষ্টিতে একান্তভাবেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তিনি প্রকৃতি ও ঘটনাপ্রবাহ থেকে তাঁর মনোযোগ প্রত্যাহার করে নিয়ে তাকে মনোজীবনের উপর স্থাপন করেছিলেন। এই আত্যন্তিক মনোজীবিতা মানিকবাবুর পক্ষে শুভফলদায়ক হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। এর ফলে তাঁর বিষয়বস্তুর পরিধি স্বতঃসংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। একাধিক বিষয় থেকে ইচ্ছামত বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা তিনি নিজ হস্তেই খণ্ডিত করেছিলেন। জীবনের আলো-গান-হাসি-প্রেম ও সৌন্দর্যের দিকে না তাকিয়ে তিনি মানবীয় সত্তার অন্ধকার গহনে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিকে সঞ্চালিত করে সাহিত্যের সুখস্বাদ থেকে নিজেকে ইচ্ছাপূর্বক বঞ্চিত করেছিলেন। জীবনের আপাতমনোরম রূপের অন্তরালে প্রায়শঃ যে কঠিন সত্যের পটভূমি বিলম্বিত থাকে, সত্যকথনের উন্মাদনায় তিনি সেই কৃষ্ণ পশ্চাৎপটটিকে লোকচক্ষে প্রকটিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। মানিকবাবুর 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'অহিংসা,' 'প্রাগৈতিহাসিক,' 'আজ-কাল-পরশুর গল্প,' 'বউ' পর্যায়ের গল্প ইত্যাদি সকল রচনাতেই তাঁর শিল্পিজীবনের এই বিশেষ মানসভঙ্গীটির পরিচয় পাওয়া যায়।

তাই বলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিছক ক্লেদরতির উপাসক ছিলেন না। ক্লেদ তিনি ঘেঁটেছেন ঠিকই, কিন্তু এক আন্তরিক দুর্মর সমাজকল্যাণের প্রণোদনার বশে তিনি এই পথে অগ্রসর হয়েছেন। যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজের সত্যিকার রূপটি যে কত কদর্য ও নিষ্ঠুরদর্শন এইটিই বার বার তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। পাঠকের মনে অসার যৌনানুভূতির সুড়সুড়ি দেবার জন্য নয়, পরন্তু প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে পাঠকের চেতনাকে জাগ্রত করবার জন্য, সম্ভবস্থলে পাঠক-মনে ওই অসম সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলবার বিদ্রোহী-প্রেরণা যোগাবার জন্যই তিনি ওই প্রক্রিয়ার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এই দিক্ দিয়ে মানিকবাবু

ছিলেন আমাদের সাহিত্যে সবচেয়ে চরিত্রবান লেখক। আর সব লেখকই কোন-না-কোন ভাবে স্থিতাবস্থার (status quo) সঙ্গে রফা করে চলেছেন, কিন্তু তিনি একেবারেই আপোসবাদী লেখক ছিলেন না। তাঁর সত্যসন্ধানের দৃষ্টিকোণ ও প্রণালীতে ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর সত্যসন্ধানের আকুলতায় কোন খাদ ছিল না। মানিকবাবুর অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তাঁকে মূল্যও বড় কম দিতে হয় নি। তবে সংসারজীবনের পক্ষে যা বঞ্চনাস্বরূপ, তা-ই তাঁর সাহিত্যজীবনকে আরও বেশী সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিল। এক ক্ষেত্রের অলাভ অন্য ক্ষেত্রের সুদ-আসল মিটিয়ে বড় লাভে পরিণত হয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক চরিত্রবত্তার জন্য বাংলা দেশ তাঁকে কখনও ভুলবে না।

কিন্তু একটা প্রশ্ন মনে জাগে। কেন তাঁর এই আত্যন্তিক আত্মবঞ্চনা? কেন তাঁর এই দারিদ্র্যবিলাস? তাঁর সাহিত্যজীবনের starting-point-এ কিঞ্চিৎ ভুল ছিল বলে আমি মনে করি, তার ফলেই তাঁর সাহিত্য অহেতুক বিমর্ষলক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। মানিকবাবুর দুরারোগ্য cynicism তাঁকে সত্যিকার মানবপ্রেমে অভিষিক্ত হতে দেয় নি। যে মানবপ্রেম বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করে অপরিমিত এবং যা ওই দুই লেখকের রচনার উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ, সেই মানবপ্রেম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাগালের বহির্ভূত ছিল। তিনি অবশ্য তাঁর সাহিত্যে সব ছাড়িয়ে মানবপ্রেম তথা সমাজকল্যাণের বাণীই প্রচার করেছেন, কিন্তু তাঁর মনোভঙ্গীর ভিতর মানুষের প্রতি যথার্থ আত্মীয়তাবোধে কিঞ্চিৎ ঘাটতি ছিল। তাঁর মানবকল্যাণের অভীপ্সা বুদ্ধিসঞ্জাত যতটা ততটা হৃদয়সঞ্জাত নয়। সামাজিক স্তরে তিনি মানবপ্রেমের অনুশীলন করেছেন, ব্যক্তিগত স্তরে অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সম্পর্কের স্তরে তেমন করেন নি। ফলে এক ধরনের নৈরাশ্যবাদ আর মানব-অবিশ্বাসের কবল থেকে তিনি কোন সময়েই নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর সাহিত্যের এটি যে একটি মূলগত ত্রুটি সেটি স্বীকার করা ভাল।

তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-বনফুল ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসরচনার যে ধারা চলেছে তাকে প্রবন্ধে আলোচিত চতুর্থ পুরুষেরই অনুবর্তন বলা যেতে পারে। সেইজন্য এই ধারা নিয়ে আর স্বতন্ত্র

আলোচনা করা হল না। এই ধারার রচয়িতাদের ভিতর উল্লেখযোগ্য হলেন—অন্নদাশঙ্কর রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, বুদ্ধদেব বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীমতী অমলা দেবী, সুবোধ ঘোষ, অমরেন্দ্র ঘোষ, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু ও দীপক চৌধুরী। বয়সের হিসাবে এ তালিকা করা হয় নি, শক্তির তারতম্যের হিসাবেও নয়। নামগুলি যেমন-যেমন মনে পড়ল তেমন-তেমন ভাবে বসিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাঠক এর থেকে ভিন্নতর কোন তাৎপর্য আহরণ করবার চেষ্টা করলে লেখকের প্রতি অবিচার করা হবে।

সাময়িক সাহিত্যের বিচার

সমসাময়িক সাহিত্যের বিচার ও মূল্যায়ন বস্তুটি বড়ই কঠিন ও জটিলতাপূর্ণ। এ কাজে ঝুঁকি অনেক, সেই কারণে খুব কম লোককেই সমসাময়িক সাহিত্যের বিচারণায় এগিয়ে আসতে দেখা যায়। যাঁরা এগিয়ে আসেন তাঁদের সাহিত্যনিষ্ঠা হয়তো প্রশংসনীয় কিন্তু তাঁদের বৈষয়িক বুদ্ধি যে কম সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

তাঁদের বৈষয়িক বুদ্ধির স্বল্পতা বোঝা যায় তাঁদের আলোচ্য বিষয়বস্তু নির্বাচনের প্রকৃতি থেকে। যে-কোন বিষয়ের মূল্য-নিরূপণ চেষ্টা বা সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ এমনিতেই অনেকখানি বাদ-প্রতিবাদের আবহাওয়া সৃষ্টি করে, সে বস্তু যদি সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে হয় তবে তো আরও জটিলতার উদ্ভব হয়। মন্তব্য মাত্রেরই একটি পক্ষ এবং একটি প্রতিপক্ষ আছে। সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এই পক্ষ-প্রতিপক্ষের চেতনা অতিশয় প্রবল হয়ে ওঠে। যেহেতু সাময়িক সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখকেরা সকলেই বর্তমান এবং, প্রায়-ব্যতিক্রমবিহীন ভাবেই বলা যায়, কোন-না-কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই কারণে সমসাময়িক সাহিত্যের মূল্যায়ন চেষ্টার অর্থ ই হল কোন-না-কোন পক্ষের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া, এবং আংশিক ভাবে স্বদলীয়দের সমর্থন লাভ। সমর্থনের বেলায় 'আংশিক ভাবে বললাম এজন্য যে, এ সকল ক্ষেত্রে সমর্থন অপেক্ষা বিরোধিতার মনোভাবটিই অধিক সক্রিয় হয়ে থাকে। বিরুদ্ধাচরণের প্রকৃতির মধ্যেই এমন একটা প্রাবল্য আছে, যা সমর্থনক্রিয়ার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে অনেক সময়েই সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচকদের ভাগ্য হয় বিড়ম্বিত, তাঁরা তাঁদের অভিমত প্রকাশের আয়োজনের দ্বারা ভিন্নমতাবলম্বী এক বা একাধিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধতা স্বতঃই প্রবলভাবে আকর্ষণ করেন। তাঁদের নিরপেক্ষবিচারপ্রয়াসী হয়েও কোন লাভ হয় না; কেন না, যতই না কেন তাঁরা সত্যান্বেষী ও অসূয়াবুদ্ধিবিমুক্ত হোন, তাঁরা বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হনই, এবং বলাই বাহুল্য, তাঁদের জীবন সেই অনুপাতে বাদ-প্রতিবাদের আঘাত-সংঘাতের দ্বারা আবর্তসঙ্কুল হয়ে ওঠে। সাধ করে এই ভাগ্য যাঁরা বরণ করে নেন তাঁদের, আর যা-ই থাক্, সংসারজ্ঞান আছে এমন কথা বলা যায় না।

এই দিক্ দিয়ে বিগতকালীন সাহিত্যের আলোচকদের ভাগ্য অনেক জটিলতাযুক্ত। বেশীর ভাগ আলোচক বা সমালোচক যে সমকালীন সাহিত্যের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বিগতকালীন সাহিত্যের উপর তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন সে প্রধানতঃ এই কারণেই করেন। ওই এলাকায় অধ্যাপকদের ভিড় এই কারণেই হতে দেখা যায়। অধ্যাপকশ্রেণীর লিখিয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মভাগ্যোন্নয়নপ্রয়াসী ও শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাঁরা ধাপে ধাপে career গড়তে চান, অতশত ঝামেলায় যেতে চান না। নিরাপত্তা আর শান্তি-স্বস্তির দুর্গে অবস্থান করে তাঁরা তদনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করেন এবং ওই প্রক্রিয়ার দ্বারাই বিরুদ্ধতাকে কম-বেশী ঠেকান। তা ছাড়া, বিগতকালীন বিষয়ের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীকরণের নিজস্ব কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, পুরাতন বিষয়ের বিচারণার মূল্যমান আগে থেকেই একপ্রকার স্থির-নির্দিষ্ট থাকে, অতএব নিজে থেকে নূতন মূল্যমান উদ্ভাবনার আর দায়িত্ব নিতে হয় না। মাইকেল মধুসূদন বড় কবি বা বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক এই তথ্য নিয়ে আজ আর বিবাদ-বিসংবাদের অবকাশ নেই; ওই তথ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায়-সর্বস্বীকৃত সত্যের মর্যাদা পেয়ে গেছে। সুতরাং তাঁদের যে-কোন একজনা সম্পর্কে আলোচনার বেলায় starting point-এর সত্যাসত্য নিয়ে আজ আর দ্বিধায় পড়বার অবকাশ নেই, ওই তথ্যকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে তার পরের সোপান থেকে আলোচনা আরম্ভ করাটাই আজ রীতি। কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচকের ভাগ্যে তেমন কোন সুবিধা জোটে না। তাঁকে তাঁর মূল্যবিচারের মাপকাঠি নিজেকেই নিজের চেষ্টায় উদ্ভাবন করে নিতে হয়। সাহিত্যের সাধারণ সূত্রের জ্ঞান ছাড়া তাঁর সম্মুখে আর কোন premise উপস্থিত থাকে না, যাকে অবলম্বন করে তিনি অগ্রসর হতে পারেন। আলোচনার starting point একান্তভাবেই তাঁর স্বকীয় বিচারবুদ্ধির সৃষ্টি, এবং স্বনির্মিত ওই প্রারম্ভিক ভিত্তি থেকেই তিনি তাঁর যা-কিছু সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হন। তাঁর বিচারক্রিয়ায় যদি সত্য থাকে তবে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রায়শঃ পরবর্তী কালের আলোচকদের starting point-এ রূপান্তরিত হয়, কিন্তু নিজে তিনি সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকেন। সমসাময়িকতার একটা মস্ত অসুবিধা এই যে, কাল এই ক্ষেত্রে আলোচকের প্রতিকূলাচারী। সমসাময়িক সাহিত্য সমসাময়িক বলেই তা কালের অনুমোদন লাভ করে না। কালের প্রলেপ এখনও তার উপর পড়ে

নি। আজকের কোন রচনা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে কি না তা আজই জোর করে বলবার উপায় নেই। কালের ধোপের আছাড় খেয়ে অনেক লেখাই হয়তো জরাজীর্ণ, বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কিছুসংখ্যক মাত্র টিকে থাকতে পারে। সেই অনিশ্চিত সম্ভাবনাটি অদ্যতন সাহিত্যের আলোচকের সম্মুখে বিলম্বিত। সেই অনৈশ্চিত্যকে স্বীকার করে নিয়েই তাঁকে আলোচনায় অগ্রসর হতে হয়। আর ঠিক এই কারণেই তাঁর দায়িত্ব আরও বেশী। আজকের দিনের লেখকদের মধ্যে কার লেখায় সত্যি সত্যি শক্তির প্রতিশ্রুতি আছে, কার লেখায় নেই, কার লেখা চটকদার সাময়িক জেল্লার আতশবাজি মাত্র, আলোচককে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে সে বিষয়ে রায় দিতে হয়। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এ কাজ যতই সতর্কতার সঙ্গে, যতই পক্ষপাতবিমুক্ত মনোভাবের সঙ্গে সম্পাদিত হোক না কেন, তা বিতর্কের সূত্রপাত করবেই। স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ ওত পেতেই আছে, সমালোচকের কোন কথা মনঃপূত না হলে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে তাঁদের মুহূর্তেকের বিলম্ব হয় না।

এই কারণে দেখা যায়, সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচকের সংখ্যা ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে। সাহিত্য-সমালোচনায় অত্যুৎসাহ না থাকলে কেউ এ কাজে বড়-একটা এগিয়ে আসতে চান না। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে ভিড় লেগেই আছে, কিন্তু এই বিভাগের জনবিরলতা অতি স্পষ্ট। এই বিভাগ জনবিরল; কেন না, সাধ করে অপ্রীতি ও প্রতিকূলতার ঝুঁকি নেওয়ার মত মনোবল সমাজে সংসারে বেশী লোকের থাকে না। নিতান্ত বেপরোয়া মনোভাবের অধিকারী ব্যক্তিদেরই শুধু এই কাজে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। সমাজের অধিকাংশ মানুষই স্বস্তির নীতিতে বিশ্বাসী, আরাম-আয়েসে কাল যাপন করতে চায়। যে কাজে বিপদের সম্ভাবনা কম, অন্যের অপ্রীতিভাজন হতে হয় না, কাউকে চটাবার দায় থাকে না, তেমন কাজ গভীর পরিশ্রমযুক্ত হলেও সে কাজে লোক এগিয়ে আসে; কিন্তু কাজের পরিণামে স্বার্থহানির আশঙ্কা যেখানে বিদ্যমান, সেখানে কারও টিকিটিরও দেখা পাওয়া যায় না। সাহিত্যের যে সকল বিভাগ নিরাপত্তাবোধের দ্বারা সুরক্ষিত, সুখ-শান্তি আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতিবাহী, সেই সব বিভাগেই গুটিসুটি সবাই গিয়ে ভিড় জমিয়েছে; প্রতিরোধের বা বিতর্কের এলাকায় কারও নাগাল ধরা কঠিন। সাহিত্যে কার্যরত ব্যক্তিদের মানসিক গঠন দিয়ে যদি সাহিত্যের প্রকৃতি

নির্ধারণ করতে হয় তা হলে বলতেই হয় যে, সমসাময়িক-বাংলা সাহিত্য থেকে adventure-এর মনোভাব ক্রমশ অন্তর্হিত হচ্ছে। আমরা কম-বেশী প্রায় সবাই 'ধরি মাছ না-ছুঁই পানি'-নীতির ভক্ত হয়ে উঠেছি। সাহিত্য চর্চা করব অথচ স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে না বরং সর্বপ্রকারে স্বার্থ সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের চেষ্টা করব—এই হয়েছে আজকের দিনের শতকরা নিরনব্বুই জন লেখকের মনোভাব। ফলে সাহিত্যের তথাকথিত সৃষ্টিধর্মী শাখাগুলিতে লেখক গিজগিজ করছে; এদিকে সাহিত্যের মূল্যায়নের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জনশূন্য খাঁ-খাঁ করছে। সবাই কল্পিত সৌন্দর্যের বিগ্রহের বেদীমূলে অর্ঘ নিবেদন করতে উৎসুক; সত্যের অকুণ্ঠিত, বলিষ্ঠ ঘোষণা-রূপ সাহিত্যের অন্য একটি আবশ্যিক কর্মের বিভাগ নিছক সেবকের অভাবেই পরিত্যক্ত হবার উপক্রম হয়েছে। সাহিত্যের সমালোচনায় আমাদের উৎসাহ নেই, সমাজ-সমালোচনায় আমাদের উৎসাহ নেই, বস্তুতঃ কোন প্রকার সমালোচনাতেই আমাদের কোন প্রকার উৎসাহ নেই। সৃষ্টিধর্মী রচনার পাশে সমালোচনাধর্মী রচনার বিকাশ না হলে যে সৃষ্টিধর্মী রচনারই জোর কমে যায় এই বোধ পর্যন্ত সাহিত্যিক সম্প্রদায় থেকে বিলুপ্তপ্রায়। কোথায় লেখকেরা আত্মস্বার্থে সাময়িক সমালোচনা-সাহিত্যের বিকাশ হতে দেবেন, তা নয়, যেটুকু সমালোচনাও বা কালেভদ্রে হয় তাকেও গলা টিপে হত্যা করতে তাঁরা উদ্যত। সাহিত্যের বিকাশ এই ভাবে অযথা প্রতিহত হচ্ছে।

আজকাল সাময়িক-সাহিত্য-আলোচনার আসরে আর লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এ বিষয়ে যাবতীয় কর্মতৎপরতা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে দৈনিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে এবং প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানগুলির বিজ্ঞাপন-সাহিত্যে। বহু লেখক নিরপেক্ষ সমালোচকের কাছে কল্কে না পেয়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আত্মপ্রচারে নিয়োজিত হয়েছেন। বশংবদ প্রকাশকদের সাহায্যে নিজেদের ঢাক জোরে পিটিয়ে নিচ্ছেন। যাঁর অর্থবল বেশী তাঁর বিজ্ঞাপনবল বেশী, সুতরাং তাঁর আত্মপ্রচারক্ষমতাও বেশী। ফলে আত্মপ্রচারে আত্মপ্রচারে বাংলা সাময়িক পত্রগুলি ছয়লাপ হতে বসেছে। বইয়ের বিজ্ঞাপন তো নয়, লেখকের সুমহতী কীর্তির উৎকীর্ণ শিলালিপি-খচিত উদ্দণ্ড বিজয়স্তম্ভ! সত্যসন্ধ ব্যক্তিকে স্তম্ভিত করবার পক্ষে এ-জাতীয় বিজ্ঞাপনী সাহিত্যের কয়েকটি পংক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু এ-জাতীয় আত্ম-রটনা আমরা পছন্দ করি আর না-ই করি, এইটেই এখনকার সাহিত্যের

সত্যিকারের পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত ভাষণের এমন সর্বনাশা আধিপত্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আর দেখা যায় নি। সাহিত্যের মূল্যবিচার বলতে এখন এই অসত্যকথনপরিপূর্ণ বিজ্ঞাপনী সাহিত্যকেই বোঝায়। এই বিজ্ঞাপনী সাহিত্য শাঁখের করাতের মত দুই দিক্ দিয়ে সাহিত্যকে কাটছে। আত্মপ্রচারের আতিশয্যে বইয়ের প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে পাঠকসাধারণের ধারণা বিভ্রান্ত হয়, অন্যপক্ষে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত বা সার্টিফিকেট সাজিয়ে বিজ্ঞাপন রচনা করা হয়, তাঁরা প্রায়শঃ গ্রন্থকার বা প্রকাশকের ফাঁদে পা দিয়ে আত্মমর্যাদার অপহ্নব ঘটান। কেউ কেউ আবার এতে এক ধরনের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানও অনুভব করেন। পত্র-পত্রিকায় অভিমতদানকারীরূপে নিজ নিজ নাম বিজ্ঞাপিত হওয়ায় তাঁদের অহংচেতনায় বেশ খানিকটা সুড়সুড়ি জাগে। কিছুদিন ধরে কতকগুলি গ্রন্থের ফলাও পরিচিতি নানা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে গ্রন্থ-সমালোচনা হিসাবে এবং বিজ্ঞাপন হিসাবে। কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তির অভিমত পাঠকদের চমৎকৃত চক্ষুর সামনে বঁড়শির টোপের মত ঝুলিয়ে রেখে প্রচারের এক সুপরিকল্পিত বিধিবদ্ধ অভিযান চালানো হচ্ছে। সংপ্রতি দেখছি একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত পত্রের দীর্ঘ অংশ গোটাটাই বইয়ের বিজ্ঞাপন হিসাবে ছাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এ আমরা বাংলা সাহিত্যকে কোথায় নিয়ে চলেছি! বাংলা সাহিত্যের কল্যাণকামী ব্যক্তি কেউ কি ভেবে দেখেছেন, সাহিত্যের নেপথ্যে যে সকল মতামত নিতান্তই ব্যক্তিমনের রুচি-পছন্দ হিসাবে এলোমেলো ভাবে ব্যক্ত হয়, তাকে প্রকাশ্যে টেনে এনে সাহিত্যের কোন্ মহদুপকার সাধন করা হচ্ছে? আমরা কি সবাই সাহিত্যের বিচার-ঘোষণা-রূপ কার্যটিকে ঘরোয়া কলকাকলিতে পরিণত করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছি? সাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ রূপ বলে কিছু থাকবে না, সবটাই domestic affair হয়ে উঠবে— এই কি আমরা চাইছি? নয়তো যা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত মতামতসংবলিত ঘরোয়া পত্র এবং যা সেই ভাবেই গণ্য হোক এই সম্ভবতঃ পত্রলেখকের অভিপ্রায়, সমস্ত চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে তাকে কেন তারস্বর বিজ্ঞাপনরূপে পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হতে দেওয়া হয়? দিনে দিনে বাংলা সাহিত্যে এ কী হতে চলেছে! শোভনতার বালাই নেই শালীনতার বালাই নেই, কেবল তদ্বির-তদারক দরবার-ধরাধরি তোষামোদ পারস্পরিক পৃষ্ঠকণ্ডূয়ন ও

পারস্পরিক স্বার্থ-সংবর্ধন, বন্ধুকৃত্য আর আত্মীয়ানুগ্রহ। বৃথাই আমরা গীতোক্ত ফলপ্রত্যাশাবিহীন কর্মের নীতিতে আস্থা স্থাপন করেছিলাম, এখন দেখতে পাচ্ছি সে নীতি আমাদের লেখকবর্গ অনেক আগেই শিকায় তুলে রেখে দিয়েছেন। তাঁরা এখন বড় বড় মাতব্বর পাকড়াও করে তাঁদের সার্টিফিকেট আদায়ের কাজে উঠে-পড়ে লেগেছেন। কে নিজের অনুকূলে বা নিজের বইয়ের অনুকূলে কত ঢাউস প্রশংসা-পত্র আদায় করতে পারেন—এই নিয়ে গ্রন্থকার আর প্রকাশকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অন্ত নেই। স্কুলের ছেলেরা পরীক্ষার পর মাস্টার মশায়দের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পরীক্ষার নম্বর বাড়াবার উদ্দেশ্যে তাঁদের যেমন মন ভিজোবার চেষ্টা করে, এখন সেই বালখিল্য অভ্যাস বয়স্ক লেখকদের মধ্যেও পুরোমাত্রায় সঞ্চারিত হয়েছে। এখন লেখার কাজে যত না সময় ব্যয় হয় তার চেয়ে বেশী সময় ব্যয় হয় এই-জাতীয় অবান্তর কাজে। পরীক্ষার পরেরও যে পরীক্ষা—যাকে স্নাতকোত্তর ছাত্রমহলের পরিভাষায় ঠাট্টা করে ninth paper বলা হয়—সেই অশেষ ফলপ্রদ মোক্ষম পরীক্ষাতেই লেখকসমাজ এখন সবিশেষ দড় হয়ে উঠেছেন দেখতে পাচ্ছি। তোষণ আর তোষামোদে সাহিত্যের আকাশ-বাতাস ভরে উঠবার উপক্রম হয়েছে। ফলের অপেক্ষাহীন নিষ্ঠাপূর্ণ তদ্‌গত কর্মাদর্শ আজ নিতান্ত কথার কথা হয়ে উঠেছে বললেও চলে।

সাহিত্যের এই পরিস্থিতিতে সাময়িক সাহিত্যর বিচারক্রিয়া যে প্রায়শঃ বিচার-বিভ্রাটে রূপান্তরিত হতে বাধ্য, তা বোধ করি বিশদ বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। সাময়িক সাহিত্যের বিচারণার এলাকায় এখন উপযুক্ত যোগ্যতা ও প্রস্তুতি-সম্পন্ন ব্যক্তি সংখ্যায় খুবই কম, সেইজন্য অব্যাপারী অথচ নিজ নিজ ক্ষেত্রে হোমরা-চোমরা সব ব্যক্তিদের বেছে বেছে তাঁদের দিয়ে সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেবার হিড়িক পড়ে গেছে। কেবল ধরাধরি সুপারিশ উমেদারি আর তদ্বির-তদারকি। সাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিক সাধারণ রূপ আর আদৌ বজায় থাকছে না।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে সাহিত্যের মূল্যায়ন আর বেশী কী হবে? কে সেই ব্যক্তি যিনি অনুগ্রহ-নিগ্রহের পরোয়া না করে, সত্যনিষ্ঠার দৃঢ়ভূমির উপর দাঁড়িয়ে নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়নক্রিয়ায় সহায়তা করবেন? এই শ্রেণীর আলোচকের কর্ম সক্রিয়তামণ্ডিত ও স্ফূর্তিময় হওয়ার মত পরিবেশ সাহিত্যসমাজে কোথায়? সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের সমগ্র

পরিধি জুড়ে যে এক মহা আত্মীয়তার শ্রীক্ষেত্র বিরাজ করছে! সাহিত্যের মর্যাদাময় নিরাসক্ত প্রকাশ্য রূপ প্রায়ান্তর্হিত হয়েছে, তা ক্রমেই ঘরোয়া ব্যসনে পরিণত হতে চলেছে। চারদিকের রকম-সকম দেখে আমার এক এক সময় এমন পর্যন্ত মনে হয়, বাংলা সাহিত্য নিতান্তই গণ্ডীবদ্ধ একটি ক্ষুদ্র সীমানায় বসবাসকারী কতকগুলি লোকের হাত-পা-ছোঁড়ার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে কেউ কারও মামা, কেউ জ্যেঠামশায়, কেউ পিস্‌শ্বশুর, কেউ ন' মাসি, কেউ ফুলদি, কেউ আর কিছু। ফলে সাহিত্য সুবাদে মতামতদানের নামে আত্মীয়তার এক হরিহরছত্র মেলা বসে গেছে কলকাতা শহরে। দেশ-বিভাগের ফলে আমাদের নিজ রাজ্যের আয়তন যেমন সংকুচিত হয়ে গেছে, তেমনই তার সাহিত্যের পরিধিরও দৃষ্টিগ্রাহ্য সংকোচন ঘটেছে। বাংলার সাহিত্য নামক পূর্ব-ঐতিহ্যযুক্ত বিরাট্ ঐশ্বর্যময় সুবিশাল সংস্কৃতি-আন্দোলন এখন কলেজ স্ট্রীটের গলিঘুঁজিতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং সেইখানেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। এখন নৈর্ব্যক্তিক নিরপেক্ষ প্রকাশ্য সমালোচনায় আর লেখকদের আস্থা নেই, নেপথ্যের কলকাঠি-সঞ্চালনপটুত্বের উপরই যেন লেখকদের আস্থা বেশী বলে মনে হয়। প্রকাশকেরা স্বার্থসিদ্ধির তাড়নায় নেপথ্যবিহারী হয়ে কাজ গুছোবার তালে থাকুন তাতে তেমন দোষ দেখি নে—যদিও নীতির দিক্ থেকে তাও সমর্থনের অযোগ্য—কিন্তু লেখকেরাও যে শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়বুদ্ধিমাত্রসম্বল প্রকাশকদের পথ ধরবেন তা অভাবিত ছিল। লেখকেরা যদি তদ্বির-তদারকিতেই সময় কাটাবেন তো লিখবেন কখন! তাঁরা আসন ছেড়ে উঠে ধরনা দেওয়ার অভ্যাস করলে সাহিত্য এগোবে কী করে! আজকাল আবার এই হত্যে দেওয়ার কাজে লেখকের একার ভক্তিই যথেষ্ট নয়, সস্ত্রীক এই পূজাপর্ব নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ লেখকের কলম যেমন বন্ধ হবার যোগাড় তেমনই তাঁর হোম ফ্রণ্টও বিকল হবার উপক্রম। গিন্নীবান্নী মানুষের আর খেয়েদেয়ে কার্জ নেই, তিনি হাতা বেড়ি খুন্তি ফেলে লেখক স্বামীর সঙ্গে অনিশ্চিত স্বার্থসাধনের আশায় দুয়ারে দুয়ারে ঢিকোতে থাকুন আর এদিকে পরিবারের সকলের আহার-বিহার মাথায় উঠুক! সাহিত্য, না, গেরো!

ঠাট্টা নয়, সমকালীন বাংলা সাহিত্যের ঠিক এই হালই আজ দাঁড়িয়েছে। যেদিন থেকে এই সাহিত্যে উমেদারি আর সুপারিশের সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে, সেইদিন থেকে লেখকের মর্যাদাও ক্রমশঃ ভূলুণ্ঠিত হয়ে চলেছে এবং

তদনুপাতে এ সাহিত্যে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন আর বিচারণার আদর্শও ক্রমক্ষীয়মাণ হয়ে আসছে। ধরাধরিতেই যখন কার্যোদ্ধার হয় তখন নিরপেক্ষ বিচারণায় মূল্য আরোপ করে বোধ হয় একমাত্র আদর্শবাদী মূঢ়, আর কেউ নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলার সাহিত্যসমাজের পরিধি দেশ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বলতে গেলে কলকাতা শহরে এসে ঠেকেছে। এই সংঘটনের তাৎপর্য আজ হয়তো স্পষ্ট ঠাহর হচ্ছে না, কিন্তু ধীরে ধীরে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দেশ-বিভাগের ফলে কত দিক্ দিয়ে কত মূল্য আমাদের দিতে হয়েছে ও হচ্ছে তা ক্রমশঃ প্রকট হতে থাকবে। এখন মফস্বল বা গ্রামাঞ্চল কলকাতার সাহিত্যচিন্তায় প্রায়-অনুপস্থিত। বাংলার সাহিত্য বলতে এখন কলকাতার সাহিত্যকেই প্রধানতঃ বোঝায়, আরও স্পষ্ট করে বললে কলেজ স্ট্রীটের সাহিত্য। এখন বই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটোছুটি পড়ে যায় কাকে দিয়ে দৈনিক পত্রিকায় রিভিয়্যু লেখাতে হবে, সার্টিফিকেট লেখাবার জন্য কোন্ কোন্ মহারথীর দ্বারস্থ হতে হবে। প্রথমতঃ মহারথীরা সার্টিফিকেট দেবার জন্য নিজেরাই কলম শানিয়ে বসে থাকেন, এতে তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ আত্মাভিমান তৃপ্ত হয় ; দ্বিতীয়তঃ, পরিচয়ের সূত্রেই হোক আর ব্যবসায়িক স্বার্থসূত্রেই হোক, তাঁদের ধরপাকড় করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। সময় সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রও বেরিয়ে পড়ে। তাতে কার্যসিদ্ধির আরও সুবিধা হয়। পশ্চিমবঙ্গের এই ক্ষুদ্র এলাকাবদ্ধ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থশাসিত মাথাভারী সমাজে বুদ্ধিজীবী মহলে সবাই সবাইয়ের আত্মীয়। একটু খবর করলেই আত্মীয়তার সুতো এবং ছুতো বেরিয়ে পড়ে। ফল : আত্মীয়বধপর্বনিষ্পাদন। তৃতীয় শ্রেণীর বইয়ের প্রথম শ্রেণীর প্রশংসামূলক আলোচনায় ও স্তুতিতে সত্যই এক এক সময় কান পাতা দায় হয়ে ওঠে।

বর্ণিত অবস্থা এমনিতেই যথেষ্ট মন্দ, সেটি আরও মন্দ হয়েছে রবীন্দ্র-পুরস্কার আর আকাদেমি-পুরস্কার প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে। তথাকথিত জনপ্রিয় লেখকদের চোখে এখন আর ঘুম নেই। কাকে ধরলে কে কাবু হবেন এই হিসেব-নিকেশের চিন্তাতেই তাঁদের বারো-আনা সময় কেটে যায়। সবাই স্বপ্ন দেখছেন রবীন্দ্র-পুরস্কার পাবেন, চাই কি আকাদেমি-পুরস্কারের মোয়াও হাতের তেলোয় এসে ছিটকে পড়তে পারে, কাজেই কলকাতার লেখক-ফ্রণ্টে এখন নিত্য সাজ্-সাজ্ রব। ইনি তাঁকে লুকিয়ে, তিনি এঁকে পাশ কাটিয়ে, মাতব্বরদের বাড়িতে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। লেখকদের একটি ধারণা

হয়েছে এই যে, যিনি যত বড় বহরের বই লিখবেন পুরস্কার পাওয়া তাঁর পক্ষে তত সহজতর হবে। ফলে লেখকদের মধ্যে কে কত ডাগড়াই আকারের বই দাঁড় করাতে পারেন তার এক অলিখিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। রবীন্দ্র-পুরস্কার এবং আকাদেমি-পুরস্কার দুটিই সরকারী পুরস্কার। প্রথমটি রাজ্য সরকারের, দ্বিতীয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের। ফলে লেখকদের ভিতর এখন সরকারী মহলের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য প্রচণ্ড এবং অভাবিতপূর্ব এক আকুলতার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের কেষ্টু বিষ্টু-শ্রেণীর ব্যক্তিরা তো আছেনই, ন্যূনতম ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারওয়ালাদের সঙ্গেও দহরম-মহরমের অন্ত নেই। সরকারও এই বিশেষ অবস্থার সুযোগ গ্রহণে সমূহ তৎপর। ফলে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক অভিনব আত্মীয়তার দৃশ্য প্রকটিত হয়েছে। নূতন নূতন এলাকায় আত্মীয়তার সম্প্রসারণে পরিচয়ের পরিধির ব্যাপ্তি ঘটছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বিশেষ এলাকার আত্মীয়তায় যে লেখকদের আত্মমর্যাদা সবিশেষ সংকুচিত হবার আশঙ্কা আছে সেটি তাঁদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। লেখকদের মধ্যে ওই আকাঙ্ক্ষিত বোধোদয় হবে কবে?

সমালোচকের দায়িত্ব

আজকাল সমালোচকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নানা মহল থেকে নানা রকমের উপদেশ-পরামর্শ বর্ষিত হতে শুরু করেছে। কেউ বলছেন, সমালোচনার কাজ হওয়া উচিত 'গঠনমূলক'; ওর ভিতর প্রতিকূল বা প্রতিবাদাত্মক মন্তব্যের স্থান থাকা উচিত নয়। কেউ বলছেন, সমালোচনা-সাহিত্য মূলতঃ হওয়া উচিত উপভোগাত্মক; কোন সৃষ্টিধর্মী গ্রন্থ বা রচনা ভাল লাগলে তার গুণকীর্তনের জন্যই শুধু সমালোচকের লেখনী ধারণ করা উচিত, ভিন্নতর বা বিপরীত উদ্দেশ্যে সমালোচকের লেখনী ধারণ করা উচিত হয় না। কেউ বলছেন, সমালোচনায় লেখকের দোষের বা অপূর্ণতার দিক্‌গুলি দেখাবার প্রয়োজন নেই, শুধু তাঁর গুণের দিক্‌গুলির উপরেই সমালোচকের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। সমালোচকের কাছ থেকে পাঠক দোষগুণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারমূলক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আশা করেন না, লেখকের গুণাবলীর ব্যাখ্যান করে সেগুলিকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারলেই সমালোচকের দায়িত্ব খালাস হল, ইত্যাদি ও প্রভৃতি।

বলা প্রয়োজন, উল্লিখিত সব-কয়টি নির্দেশনামাই সমালোচকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ রকম সন্দেহ করবার কারণ আছে যে, ওর প্রত্যেকটিরই পিছনে স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের আত্ম-পক্ষপাতী বুদ্ধির প্ররোচনা বিদ্যমান। সমালোচনা 'গঠনমূলক' হওয়া উচিত এই জিগির তাঁরাই বেশী তোলেন, যাঁরা প্রতিবাদের ভয়ে সর্বদা জড়সড়, প্রতিকূল মন্তব্য যাঁরা সহ্য করতে পারেন না, আরও স্পষ্ট করে বললে, কেবলমাত্র আত্মপ্রশংসা শুনতেই যাঁরা ভালবাসেন। বলা বোধ হয় অনাবশ্যক, এই আত্মাদর, এই আত্ম-পক্ষপাতী লক্ষণ তথাকথিত সৃষ্টিধর্মী লেখকদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী মাত্রায় প্রকট। গল্প-উপন্যাসকার বা ওই শ্রেণীর অন্যান্য রচয়িতাদের মধ্যে এই রকমের একটা ধারণা বহুদিনের অভ্যাসে ও প্রতিবাদহীনতায় প্রায়-বদ্ধমূল হয়েছে যে, তাঁরা হলেন ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহভাজন জীব, ক্রমাগত তাঁদের রচনার গুণাবলীর বিশ্লেষণ করা এবং ওই বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যানের সাহায্যে তাঁদের সপ্তম স্বর্গে চড়ানোর কাজে সাহায্য করা ছাড়া সমালোচক-শ্রেণীর আর কোন করণীয় থাকতে পারে না। তাঁরা মনে করেন সমালোচকের কাজটি তাঁদের কাজের অনুগত ও অধীন বশংবদ

একটি কাজ, সুতরাং যখন-তখন সমালোচকের কী করা উচিত বা অনুচিত এই নিয়ে ফতোয়া জারি করতে তাঁরা আগু বাড়িয়েই আছেন। 'সৃষ্টিধর্মী' লেখকদের আত্ম-শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা এতই সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী যে, শুধু তাঁদের স্বশ্রেণীর মধ্যেই যে এই মনোভাবের প্রাবল্য দেখতে পাওয়া যায় তাই নয়, অনেক সময় সমালোচকদেরও এই মনোভাবের বলি হতে দেখা যায়। বিষয়টি পরিতাপের কিন্তু এইটেই আমাদের সাহিত্যের সত্যিকারের পরিস্থিতি।

সমালোচকের কাজকে 'সৃষ্টিধর্মী' লেখকদের অভিপ্রায়াধীন কাজ মনে করবার কোনই হেতু নেই। সমালোচক তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের শক্তিতে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত; তাঁর কাজের স্বাতন্ত্র্য আছে অতএব তাঁর ব্যক্তিত্বেরও স্বাতন্ত্র্য আছে। তিনি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন; যাঁরা তাঁর থেকে বুদ্ধিবৃত্তিতে, চিন্তার ক্ষমতায় ও বিদ্যায় খাট, সেই সব ব্যক্তির কাছ থেকে এ বিষয়ে তাঁর পাঠ নেওয়া সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার মান নেমে যাচ্ছে বলে যে-সব লেখক প্রায়শ আক্ষেপ করেন তাঁদের অধিকাংশেরই কোন ধারণা নেই, সমালোচনা কী বস্তু, কী হলে সমালোচনার মান উন্নীত হয়, কোন্ বিশেষ লক্ষণাদির দ্বারা উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট সমালোচনার পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। এ সব বুঝতে হলে সমালোচনা-সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ও শিক্ষা পূর্বাহ্নে আয়ত্ত থাকা দরকার, সে বিষয়ে যথাবিধি অনুশীলন চাই; কোনরূপ পূর্ব-প্রস্তুতি ব্যতিরেকে সমালোচনার মান উঠছে কি নামছে সে সম্বন্ধে রায় দেওয়া যায় না। যাঁরা ওইরকম রায় দেবার চেষ্টা করেন, আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়, তাঁরা নিরপেক্ষ পক্ষীয় ব্যক্তি নন, ওই-জাতীয় মতপ্রকাশে তাঁদের স্বার্থ আছে। সমালোচনা প্রশংসায় প্রশংসায় ছয়লাপ হলে তাঁরা বলে বেড়াতে থাকেন যে, বাংলা সমালোচনা সাহিত্য বাংলা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে সমান তালে এগিয়ে চলেছে; আর যাঁহাতক সমালোচনায় একটু বেসুর দেখা দিল, অমনি তাঁদের মুখ ভার হয়ে ওঠে আর প্রচার চলতে থাকে, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারাটি আশানুরূপ এগোচ্ছে না, সমালোচনার মান নেমে যাচ্ছে, সমালোচক ব্যক্তিগত অসূয়ার বশে সমালোচনা করছেন, ইত্যাদি। ভাবখানা এই, সমালোচনা লেখকের মনঃপূত হলে তবেই সমালোচনা গ্রাহ্য এবং সমালোচক প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি;. যাই তাঁর আলোচনায় প্রতিকূল মন্তব্যের আমেজ পাওয়া গেল,

অমনি সমালোচক ও সমালোচনা-সাহিত্য দুষ্ট হয়ে গেল! স্বার্থবুদ্ধি যেখানে মতামতের নিয়ন্তা, সেইরূপ মতামতের কী দাম!

এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলবার সময় হয়েছে যে, তথাকথিত সৃষ্টিধর্মী লেখকদের সেবা করবার বা বাধিত করবার জন্য সাহিত্যে সমালোচকের আবির্ভাব নয়; তিনি ভিন্ন শ্রেণীর লেখকদের কাছ থেকে নির্দেশনামা নিয়ে সাহিত্যসেবায় অবতীর্ণ হন নি। তিনি তাঁর স্বীয় প্রবণতা, শক্তি ও অন্তর্তাগিদের নির্দেশেই সাহিত্যের ওই বিশেষ বিভাগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মানসিক গঠনই তাঁর কর্মের প্রকৃতি নির্ধারণ করে; তাঁর সহজাত সংস্কারই বলে দেয় সাহিত্যের ওই বিশেষ ধারার কাজে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তি ও মুক্তি নিহিত। আমি এখানে সমালোচক বলতে পেশাদার পুস্তক-সমালোচনা-লিখিয়ে বা সময়ের চাহিদা পরিপূরণকারী কলম-চালিয়েদের কথা বলছি না, খ্যাতিমান লেখকদের খবর-কাগুজে বশংবদ সেবকেরাও আমার লক্ষ্য নন; আমি এখানে জাত-সমালোচকদের কথা বলছি। এমন সমালোচক, যিনি তাঁর অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিত্বের ও প্রতিভার দ্বারা সাহিত্যের প্রবণতা ও গতি নির্দেশ করেন, সাহিত্যকে মালিন্যমুক্ত করেন, নূতন লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টিতে সর্বপ্রকারে আনুকূল্য করেন, সর্বোপরি সাহিত্যকর্মকে বৃহত্তর সমাজ-গঠনের কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করে সাহিত্যকে এক সুমহৎ তাৎপর্য দান করেন। এ রকম সমালোচক আমাদের সাহিত্যে খুব বেশী হয় নি। বিগতদের মধ্যে আগেকার যুগে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বিপিনচন্দ্র পাল এবং এ কালে মোহিতলাল ছাড়া ঠিক এই প্রকৃতির সমালোচক বাংলা সাহিত্যে আর কেউ হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্যের আর একটা বড় দিক্ ছিল: তাঁর অনেক সমালোচনাই রচনাগুণে নিছক সমালোচনার স্তরে আবদ্ধ না থেকে অত্যুৎকৃষ্ট সৃজনাত্মক সাহিত্যকর্মের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু ওটিকে তাঁর সমালোচনা-সাহিত্যের একটি উপরি-লক্ষণ মনে করা যেতে পারে। সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ওটি আমাদের উপরি-পাওনা। ওই পাওনার উৎস তাঁর অসাধারণ কাব্য-প্রতিভা। অবশিষ্ট কয়জন তাঁদের অন্যান্য কৃতিত্বের দিক্ বাদ দিয়ে সমালোচকের প্রকৃতি অনুসারেই সমালোচক। তাঁরা জাতিগঠন ও সমাজ-সংস্কারের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রেখে সমালোচনা-সাহিত্যের চর্চায়

অগ্রসর হয়েছেন বলে তাঁদের সমালোচনা একটা বিশেষ মহিমা লাভ করেছে। তাঁরা একই সঙ্গে সাহিত্যসেবারও দাবি পূরণ করেছেন, জাতিসেবারও দাবি পূরণ করেছেন। দাবি পূরণ করেছেন সৌন্দর্যবাদী সাহিত্যিকদের মত পরোক্ষভাবে বা অচেতনভাবে নয়, সম্পূর্ণ সক্রিয় সজাগ সুনির্দিষ্ট এক কর্মাদর্শের অনুগত হয়ে। প্রকৃত সমালোচক শুধু সাহিত্যের সূত্র নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হন না, একই সঙ্গে সমাজগঠনেরও ইঙ্গিত করেন।

সত্যিকারের সমালোচক হতে হলে গঠনমূলক ও শোধনাত্মক এই উভয় সমালোচনা-রীতিতে যুগপৎ অভ্যস্ত হওয়া দরকার। সত্যকার সমালোচক যিনি, তিনি এক চক্ষুতে সৎ-সাহিত্যিকদের জন্য, চারিত্রযুক্ত সাহিত্যিকদের জন্য, প্রীতি ও প্রসন্নতার আলো বিকিরণ করবেন, অন্য চক্ষুতে সমাজবিরোধী লেখকদের জন্য তীব্র ভ্রূকুটি-কটাক্ষ উদ্যত করে রাখবেন। এক হাতে তাঁর বরাভয়, অন্য হাতে শাসনের কশা। যাকে চলতি কথায় বলে বিনাশধর্মী সমালোচনা বা destructive criticism নিছক সে-জাতীয় রচনায় তাঁর আস্থা নেই, তবে শোধনাত্মক বা নিষেধাত্মক রচনারীতিতে স্বতঃই তিনি আস্থাশীল। সাহিত্যে যখন কোন বিকারদুষ্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সেই আন্দোলনকে শাসন ও নিরস্ত করা তিনি তাঁর অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে মনে করেন এবং ওই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতিকেই ক্ষতি বলে গ্রাহ্য করেন না। অনুগ্রহের দ্বারাও যেমন তিনি বিচলিত হন না, তেমনি নিগ্রহের দ্বারাও সন্ত্রস্ত হন না। সাহিত্যের ক্ষতিকর দিক্ সম্পর্কে পাঠকসাধারণকে সতর্ক করে দেবার অপ্রীতিকর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রায়শঃ বন্ধুদের অমিত্র ভাবের তিনি উদ্রেক করেন, ভুল-বোঝাবুঝির দ্বারা কবলিত হন, অযথা নিন্দাবাদ সহ্য করেন, তবু সত্য থেকে তিনি ভ্রষ্ট হন না। তাঁর নিকট ব্যক্তি অপেক্ষা সত্য অনেক—অনেক বড়। সাময়িক প্রয়োজনে সমালোচক কখনও হয়তো গ্রন্থ-সমালোচনা করেন, কখনও গ্রন্থকারের আলোচনা করেন, কিন্তু সেটি তাঁর মুখ্য কর্ম নয়। পেশাজীবী অন্য দশজন মানুষের মত এ সব তাঁর উঞ্ছবৃত্তিমূলক কাজ, এর দ্বারা তাঁর মূল কাজ প্রতিহত হয় না। সমালোচক যেখানে তাঁর স্বভাবনির্দিষ্ট ভূমিকায় আসীন, সেখানে তিনি সামগ্রিকভাবে সাহিত্য-বিচারণায় নিয়োজিত। সাহিত্যের প্রকৃতি ও প্রবণতা নিরূপণ এবং তার গতিপথের নির্দেশদান—এই তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ। সাহিত্যের মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে প্রায়শঃ তিনি মূল্যবান

সব সমাজসত্যে উপনীত হন এবং সেই সব সত্যকে দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণাও করেন। তিনি তাঁর সমালোচক-জীবনের দীর্ঘস্থায়ী ঘাতসংঘাতময়, কখনও প্রীতিকর কখনও অবাঞ্ছিত কিন্তু সর্বাবস্থায়ই নাটকীয়-লক্ষণযুক্ত, সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাকে জাতীয় সংস্কৃতির মূল্যনির্ণয়ের কাজে লাগান। সমালোচক একাধারে ভোক্তা, বোদ্ধা ও বিচারক। তাঁর কাজের ধারার সঙ্গে যেহেতু মননশীলতা ও বিদ্যাবত্তার নিগূঢ় সংযোগ, সেই কারণে তাঁর ব্যক্তিত্ব নিছক বিশুদ্ধ সাহিত্যস্রষ্টা অপেক্ষা অনেক বেশী অপ্রতিরোধ্য। সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর অবাধ সঞ্চরণ বলে তাঁর মনটিও হয় অনেকগুণ বেশী সমৃদ্ধ ও উদার। এমন ঐশ্বর্যময় যাঁর ব্যক্তিমানস, তিনি কেন যাবেন কথামাত্রসার লেখকের অভিপ্রায় পালন করতে? ওই অধিকারই বা শেষোক্ত শ্রেণীর লেখককে কে দিয়েছে?

যাঁরা বলেন সমালোচকের কাজ হবে শুধু উপভোগাত্মক, তাঁরাও যথার্থ কথা বলেন কি না সন্দেহ। এই মতের এক সময়ে বিশেষ প্রভাব ছিল, এখন ধীরে ধীরে সেই প্রভাব সংকুচিত হয়ে আসছে। যে যুগে সমালোচকের ভূমিকাকে সৃষ্টিধর্মী লেখকের ভূমিকার নিতান্ত অধীন করে দেখা হত, সে যুগে এই মতের উদ্ভব। স্যাঁৎ-বাভের মতে "The critic's first duty is not to judge; but to understand." কিন্তু এই মত এখনকার দিনে আর বিশেষ গ্রাহ্য বলে মনে হয় না। এখন সেই শ্রেণীর সমালোচকেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশী, যাঁরা সমালোচনার কাজকে প্রধানতঃ বিচারমূলক কাজ বলে মনে করেন এবং এই কাজে রসবুদ্ধির দ্যোতনা অপেক্ষা যুক্তিবুদ্ধির উপর সমধিক নির্ভর করেন। সমালোচনা-সাহিত্য আর সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদচিহ্ন এঁকে তাঁরা শেষোক্ত প্রক্রিয়ার উপরেই তাঁদের পক্ষপাত ন্যস্ত করেন। ভাষা-বিচার তাঁদের সমালোচনী রীতির মূল ভিত্তি, যুক্তি তাঁদের প্রধান হাতিয়ার।

উপলব্ধি ও উপভোগ (Understanding and Appreciation) সমালোচনার একটি স্বীকৃত রীতি সন্দেহ নেই, কিন্তু এই রীতি স্বীকার করে নিলে সঙ্গে সঙ্গে 'সৃষ্টিধর্মী' লেখকের প্রাধান্যও স্বীকার করে নিতে হয়। আজকের দিনের আত্মসচেতন শক্তিধর সমালোচক এই অবস্থা স্বীকার করে নিতে রাজী নন। তাঁর মর্যাদাবোধে তাতে আঘাত লাগে। সমালোচনা-সাহিত্যের যতই অধিক অনুশীলন হচ্ছে, যতই নূতন নূতন শক্তিশালী লেখকের

দ্বারা এই বিভাগটির পরিপুষ্টি সাধিত হচ্ছে, ততই সমালোচনা-কর্মের পুরাতন ধারণা পরিত্যক্ত হচ্ছে। এখন আর সমালোচনা-কর্মকে তথাকথিত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের আজ্ঞাবাহী একটি বিভাগ মনে করবার কোনই হেতু নেই। আত্ম-মর্যাদায় আস্থাশীল জাগ্রতবুদ্ধি নূতন কালের সমালোচক বিস্ময় এবং বিমূঢ়তার সঙ্গে লক্ষ্য করছেন, তাঁর কার্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য যে বিদ্যা যে অধ্যবসায় যে অভিনিবেশক্ষমতার প্রয়োজন, তার অনুরূপ নৈপুণ্য সচরাচর সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে প্রযুক্ত হতে দেখা যায় না, অথচ তাঁর এই যোগ্যতার আশানুরূপ সামাজিক স্বীকৃতি নেই। পাঠক শুধু রসে টইটম্বুর হয়ে থাকতেই ভালবাসেন; চিন্তা ও বিশ্লেষণের গভীরতা, ঋজুতা, দার্ঢ্য তাঁকে তেমন আকর্ষণ করে না। তথাকথিত সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের কাজে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ও অশিক্ষিতপটুত্বের সহায়তা যত মূল্যবান এমন আর কিছু নয়। সেই কাজের একটা নিজস্ব আকর্ষণ (যথা, কাহিনীর রস, গল্পের রস, নাটকীয়তার রস) আছে বলে এলোমেলো চিন্তা আর এলোমেলো রচনারীতির ত্রুটিতে সেখানে বড়-একটা কিছু আসে-যায় না। সুসংহত চিন্তার শৃঙ্খলা ও সুবিন্যস্ত রচনা-পারিপাট্য গল্প-উপন্যাসে মার্জনীয় ত্রুটি, যদি কাহিনীর দিকটি সবিশেষ জোরালো থাকে। কিন্তু সমালোচনা-কর্মে তা হবার জো নেই। সেখানে বুদ্ধিবৃত্তি ও রসবুদ্ধিকে প্রতিপদে সচেতন রাখতে হয়; বক্তব্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও যুক্তিপরম্পরা রক্ষার জন্য অন্তরের গহন থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনিবেশ-ক্ষমতা আকর্ষণ করে তাকে রচনায় প্রয়োগ করতে হয়। তা ছাড়া সমা-লোচকের জিজ্ঞাসা বহুমুখী ও বহুদূরবিস্তৃত। যেহেতু তাঁর ভূমিকা মূলতঃ বিচারকের ভূমিকা, সেই হেতু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান তাঁকে অর্জন করতে হয়। আর শুধু সাহিত্যই বা বলি কেন, জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিভাগে সন্ধানী চিত্তের কৌতূহল প্রসারিত না করে কেউ সমালোচকের যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছেন, সাহিত্যের ইতিহাসে এমন প্রমাণ মিলবে না। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, উদার সাংস্কৃতিক চেতনা এ সবের সম্যক্ চর্চা না করলে সমালোচকের দৃষ্টিই বোধ হয় খোলে না। বিচারকের ভূমিকায় যিনি সমাসীন তাঁর তুলনামূলক পরিমাপনের রীতিতে অভ্যস্ত হওয়া চাই, আর এই তুলনামূলক পরিমাপনের প্রথম শর্তই হল বহুবিস্তৃত ও বিচিত্রবিষয়ক জ্ঞান। এই দুরূহ কৃতিত্বকে 'কিছু নয়' বলে উড়িয়ে দিয়ে যাঁরা আনন্দ পান তাঁরা সাহিত্যের সত্যের একটা খণ্ডিত দিকেরই মাত্র সন্ধান পান, পূর্ণ সত্য তাঁদের

উপলব্ধ হয় না। এরকম আংশিক সত্যের উপলব্ধির মধ্যে এক ধরনের বালকোচিত সারল্য আছে, যা এক এক সময় সমালোচকের প্রতি ঘোরতর অবিচারে পর্যবসিত হয়।

সৃষ্টিধর্মী লেখকদের বড় আশ্রয় পাঠকসম্প্রদায়। তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাযুক্ত তাঁদের কথা আলাদা, তবে গড়পরতাদের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাঠকসাধারণের নির্বিচার পৃষ্ঠপোষকতার উপর তাঁদের খ্যাতি ও কৃতিত্বের প্রাকার দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। পাঠক যত অজ্ঞ আর বিচারহীন হয় ততই এঁদের সুবিধা, কেন না তা হলেই পাঠকের মুগ্ধতা আকর্ষণের সুবিধা হয় বেশী। যে অনুপাতে পাঠকসম্প্রদায় অনুন্নত স্তরে বিদ্যমান থাকে, ঠিক সেই অনুপাতে 'জনপ্রিয়' সাহিত্যিক তাঁর জনপ্রিয়তার খোরাক আহরণ করেন। প্রক্রিয়াটা বিপরীতমুখী গতিতে অগ্রসর হওয়াই নিয়ম। কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে যাঁরা কার্যরত আছেন তাঁরা জ্ঞানীগুণী সমাজের সমর্থন পেলেও ঠিক এই জায়গাটিতে এসে অসুবিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পাঠকসাধারণের সঙ্গে তাঁদের প্রতিকূলতার সম্পর্ক। একদিকে পাঠকের অনগ্রসরতা আর অন্যদিকে তাঁদের আত্মসচেতনতা ও মর্যাদাজ্ঞানই এই প্রতিকূলতার কারণ। পাঠকের বিমুখতা ও ঔদাসীন্যের চড়ায় ঠেকে কত উৎকৃষ্ট রচনা যে বানচাল হয় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সামাজিক ও শিক্ষাগত পরিস্থিতির দোষে অনেক মূল্যবান উদ্যম এই ভাবে অযথা নষ্ট হয়। এ কথা যে কথার কথা নয়, একেবারে জলজ্যান্ত অকাট্য সত্য, আমাদের সমাজ ও সাহিত্যের বিশেষ পরিস্থিতি স্মরণ করলেই সে কথা আমরা বুঝতে পারব।

কিন্তু এই বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিকেও চিরস্থায়ী মনে করবার কোন কারণ নেই। শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এদেশে ওদেশে সমস্ত দেশেই এই পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে। এক সময়ে পাঠকসমাজে চিন্তা-সাহিত্যের প্রতি যে অবহেলার ভাব বিদ্যমান ছিল, যুগ-ধর্মের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অবহেলার পরিধি ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে। শিক্ষার বিস্তৃতি, জ্ঞান আহরণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ, জ্ঞানবাহী সাহিত্যের (literature of knowledge) সমধিক প্রচার ইত্যাদি নানা কারণের সমবায়ে পাঠকের মনোযোগেরও দৃষ্টিগ্রাহ্য পার্শ্ব-পরিবর্তন ঘটছে। কথাসাহিত্য, রম্যকাহিনী প্রভৃতির উপর একদা পাঠকসমাজের যে উগ্র

পক্ষপাত ন্যস্ত ছিল, সেই পক্ষপাতের দেওয়ালে চিড় ধরেছে। আমি পূর্বেই বলে ছ যে, পাঠকের অনগ্রসরতার সঙ্গে গতানুগতিক সাহিত্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তার একটা নিগূঢ় যোগ আছে। শিক্ষার বিস্তৃতিতে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ সামাজিক পরিস্থিতির তারতম্যের দ্বারা সাহিত্যপাঠকের রুচিরও তারতম্য হয়। সমাজ-মানস ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলবার কালে পাঠকদের মনোযোগ নিছক হৃদয়ধর্মী সাহিত্য থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় মননপ্রধান সাহিত্যের উপর স্থাপিত হতে থাকে। এই সত্য পাঠক-সাধারণের নিকট প্রকট ও প্রতীতিযোগ্য করে তোলবার মত উপযুক্ত পরিসংখ্যানগত তথ্য আমার হাতে বর্তমানে নেই, কিন্তু যাঁরা সমাজ-বিজ্ঞানী ও প রিসংখ্যান নিয়ে কাজ করেন, তাঁরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই সত্যেরই সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁরা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন, যুগের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যপাঠকের রুচি-পছন্দেরও ক্ষেত্র-বদল হচ্ছে। তাঁদের অভিনিবেশ এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া যদিও এখন পর্যন্ত ধীরমন্থর ও প্রায়-অলক্ষিত, তা হলেও তাকে ভুল করবার যো নেই।

গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের আলোচনায় শুধু গুণের কথা থাকবে, দোষের কথা থাকবে না—এই যাঁরা বলেন তাঁদের ভিতর স্বার্থসংশ্লিষ্ট লেখক পক্ষও আছেন, স্বার্থ-অসংশ্লিষ্ট সমালোচক পক্ষও আছেন। আমি এখানে বিশেষ করে শেষোক্ত পক্ষের মনোভাবের কথাই বলতে চাই। দেখা গেছে সমালোচকদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন গুণগ্রাহিতার তত্ত্ব তাঁরাই প্রচার করেন যাঁদের সামগ্রিক বিচারের আদৌ ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ সমালোচ্য গ্রন্থকারের অপূর্ণতা বা বিচ্যুতির দিক্ আদপে তাঁদের চোখেই পড়ে না, সেই নিয়ে আলোচনা তো পরের কথা। এক-একজন মানুষ থাকেন, যি নি সমগ্রভাবে লেখক-ব্যক্তিত্বকে ধরতে পারেন না; তাঁর স্বভাবগত সারল্য (এবং অচেতনতা) তাঁকে শুধু লেখকের গুণগ্রাহিতার দিকেই আকর্ষণ করে। লেখকের অপূর্ণতাগুলি সম্বন্ধে তিনি মারাত্মক রকমের অজ্ঞ থাকেন। কিন্তু সমালোচকদের মধ্যে যাঁরা পূর্ণব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ তাঁরা লেখকের গুণ এবং বিচ্যুতি উভয় দিক্ সম্বন্ধেই সমান সচেতন থাকেন এবং আলোচনা করবার সময় ওই পূর্ণসচেতনতার ভিত্তিতে সামগ্রিক ভাবেই লেখকের আলোচনা করেন। শুধু তা-ই নয়, লেখককে তিনি শুধু তাঁর গ্রন্থমাধ্যমেই বিচার করেন না; লেখকের শ্রেণীস্বরূপ,

জন্ম, শিক্ষা, আবেষ্টনী, দৃষ্টিভঙ্গী এগুলিকেও হিসাবের মধ্যে গ্রহণ করেন। লেখকের লেখকসত্তা ও সামাজিক সত্তা এতদুভয়ই তাঁর বিচার্য হয় এবং এই যুগ্ম বিচারক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লেখকের পূর্ণ সত্তাটিকে তিনি প্রকটিত করে তুলতে চেষ্টা করেন। এমনতর বিচারে গুণাবলীর মত দোষেরও কিছু কিছু আলোচনা থাকবে বইকি, তাকে এড়াবার উপায় কোথায়। সমালোচনার ভিতর ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা থাকলেই তা বিনাশধর্মী হয় না, তা শোধনের মনোভাবপ্রসূত হতে পারে, হয়েও থাকে। সমালোচনা শুধু গঠনমূলক হবে, তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা থাকবে না—এই যদি বিধান হয়, তা হলে সমালোচনা কথাটিরই কোন অর্থ থাকে না, সে ক্ষেত্রে সাহিত্য থেকে সমালোচনা নামক বস্তুটিকেই খারিজ করে দিতে হয়। সম্যক্ আলোচনা মানেই তো ভাল-মন্দের আলোচনা, গুণ-দোষের আলোচনা। অবশ্য দোষত্রুটির আলোচনা যদি অসূয়াপ্রসূত হয় বা মাত্রাতিরিক্ত হয়, নিছক ছিদ্রান্বেষণ হয়, তা হলে নিশ্চয় তার বিরুদ্ধে আপত্তি করা চলবে বইকি, কিন্তু তা না হয়ে সেটি যদি সামগ্রিক বিচারের অংশ হয়, সমালোচকের গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিশক্তির প্রমাণ হয়, সে ক্ষেত্রে নালিশ জানানোর যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ থাকতে পারে না। যে ব্যক্তির সমালোচক সত্তা পূর্ণবিকশিত, তিনি ইচ্ছা করুন বা না করুন মানুষের ভাল মন্দ উভয় দিকই এককালীন তাঁর চোখে পড়ে। তাঁর অতিরিক্ত সজ্ঞানতাই তাঁকে ওই দৃষ্টির পূর্ণতা দেয়। তিনি একই কালে পাপ-পুণ্য শুভ-অশুভ আলো-আঁধার সম্পর্কে সচেতন এবং মানুষের স্বভাব ও আচরণের ভিতর নিরন্তর ওই দ্বৈত লীলারই অভিব্যক্তি দেখতে পান। পূর্বেই বলেছি, লেখককে বাধিত করবার জন্য সমালোচক নয়; সমালোচক তাঁর স্বীয় শক্তিতে এবং স্বীয় অধিকারে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। কী তাঁর করণীয়, কী তাঁর করণীয় নয় এ বিষয়ে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন। এই ক্ষেত্রে অপরের আগু বাড়িয়ে হিতকথা শোনাবার যৌক্তিকতা বোঝা যায় না। সমালোচনা গঠনমূলক হবে, নিরবচ্ছিন্ন গুণগ্রাহী হবে—এ তাঁদেরই যুক্তি, যাঁরা সাহিত্য থেকে সর্বপ্রকার প্রতিবাদ, শোধনাত্মক আলোচনা, বিদ্রোহী মনোভঙ্গীর বিলোপ সাধন করতে চান। তাঁদের প্রতিবাদ-অসহিষ্ণুতা তাঁদের প্রশংসা-লোলুপতারই অপর পিঠ মাত্র।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের হালচাল দেখেশুনে মনে হচ্ছে, সমালোচকদের এখন বিশেষভাবে আত্মসচেতন হবার সময় হয়েছে। তাঁরা যে সত্যের

আদর্শের পূজারী, সেই মহৎ আদর্শকে সর্বপ্রকার আক্রমণ ও আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্য দলমতনির্বিশেষে একটি সংস্থার ভিতর তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাঁরা বিচ্ছিন্ন বলেই তাঁদের উপর আঘাতের পর আঘাত এসে পড়ছে অথচ সে অন্যায়ের কোন প্রতিকার হচ্ছে না। সাহিত্যের আঙিনায় শ্রেণীস্বার্থ-সংরক্ষণের জিগির তোলবার পক্ষপাতী আমরা নই, কিন্তু যে রকম দিনকাল পড়েছে তাতে ওই পন্থাশ্রয়ী হওয়া ছাড়া গত্যন্তরই বা কোথায়! তবে পাছে কেউ আমার বক্তব্যের ভিন্ন অর্থ করেন সেইজন্য বলি, সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে কর্মরত লেখকদের সঙ্গে বিবাদ পাকিয়ে তোলবার অভিপ্রায়ে এই প্রস্তাব নয়; যাতে সকলের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, পরস্পরের মধ্যে সর্বপ্রকার ভুল-বোঝাবুঝির অবসান হয়, সেই কারণেই সমালোচক-সংস্থা গঠনের অনুকূলে মত প্রকাশ। আত্মমর্যাদায় পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সকল শ্রেণীর লেখকের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চলা অন্য সকলের স্বার্থেও প্রয়োজন, সমালোচকের নিজ স্বার্থেও প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক যুগ

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্যায়ে অর্থাৎ ইংরেজ-শাসনের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান ও মর্যাদা নতুন করে মূল্যায়নের সময় হয়েছে। 'নতুন করে' বলছি এ কারণে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বা অব্যবহিত তৎপরবর্তী কালের বিচার আর এ কালের বিচারে বেশ কিছুটা প্রভেদ ঘটতে বাধ্য, কেন না ইতোমধ্যে পঞ্চাশ বছরেরও উপর গত হয়েছে এবং সাহিত্যে আমরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁদের পরেকার লেখকদের রচনার মধ্য দিয়ে যে সকল সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সেগুলির প্রকৃতির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারিত সত্যের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের বোধ বঙ্কিমচন্দ্রের বা তাঁর ঠিক পরেকার আমলের বিচারক্রিয়ায় ধরা পড়া সম্ভব ছিল না; তার জন্য পরবর্তী কালের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। আজকের যে মন নিয়ে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বিচার করব, নিশ্চয় তেমনতর মনের ভঙ্গী পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। ভালর জন্য হোক মন্দের জন্য হোক, আমরা এ কালের মানুষ, আমাদের মন একালীন ধ্যান-ধারণার দ্বারা পুষ্ট হয়েছে, আমাদের মনের উপর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর লেখকদের সৃষ্ট সাহিত্যের প্রভাবের স্রোত বয়ে গেছে; যুগরুচি ও যুগাদর্শের ছাপ আমাদের মনোভঙ্গীর ভিতর বিশেষভাবেই মুদ্রিত হয়ে গেছে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়নক্রিয়ায় একালীন মানদণ্ড প্রয়োগের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। কিন্তু এই-জাতীয় বিচার খুব বেশী হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আজ তেমন একটি চেষ্টার সূত্রে লেখনী ধারণ।

(বঙ্কিম-সাহিত্যের সবচেয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থাকে, তা হল শিল্পানুভূতি ও মনস্বিতার অপূর্ব সমন্বয়। একদিকে তিনি অনবদ্য সৌন্দর্য ও আনন্দের আধার চমৎকার সব উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে প্রখর মননশীলতা ও মনস্বিতার সাহায্যে অবিচলিত প্রত্যয়ের সঙ্গে সাহিত্যের গতিপথও নির্দেশ করে গেছেন। একাধারে তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক, চিন্তানায়ক, জাতির পথনির্দেশক। বাঙালীর চিত্তে ঐকান্তিক দেশপ্রেমের আবেগ তিনিই প্রথম সার্থকভাবে সঞ্চারিত করেছিলেন।) তাঁর হাতে নিপুণ সাহিত্যসৃষ্টি ও নিপুণ সাহিত্যপরিচালন

দুই-ই যুগপৎ সংসাধিত হয়েছে। তিনি তাঁর প্রতিভাকে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য-রচনাতেই আবদ্ধ রাখেন নি, একই সঙ্গে সার্থক সমালোচনা-সাহিত্যেরও জন্মদান করেছেন। সৃষ্টিমূলক সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্য এ দুটি বস্তু পরস্পরের পরিপূরক—এই একান্ত বিশ্বাস তাঁকে সব্যসাচীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়েছে। সমালোচনা-সাহিত্যের বেলায়ও তাঁর মন নিছক সাহিত্য-সমালোচনাতেই তৃপ্ত থাকে নি, তিনি একই কালে সমাজ-সমালোচনায়ও অগ্রসর হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর,' 'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত,' 'লোকরহস্য' ও 'সাম্য' গ্রন্থ এবং 'বিবিধ প্রবন্ধের' একাধিক প্রবন্ধ তাঁর গভীর সমাজসচেতন তথা সমাজ-সমালোচক মনের পরিচায়ক। সৌন্দর্যানুভূতির পাশে পাশে প্রশ্ন ও সংশয়শীল মনের বিচারপ্রবণতা যদি না থাকে, তা হলে সাহিত্যসাধনার বৃত্ত পূর্ণ হয় না—এই বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক শিল্পাদর্শ ছিল বলে মনে হয়।

কিন্তু আজকের দিনের লেখকদের মধ্যে তেমন কোন চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিককালীন লেখকদের মধ্যে প্রতিবাদী মনোভাব তথা সমালোচনার মনোভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে গেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা আজ অল্পবিস্তর সবাই এক কল্পিত সৌন্দর্যবাদের বিগ্রহের বেদীমূলে আমাদের লেখনীর শক্তিকে সমর্পণ করে সাহিত্যে লীলাবাদের ধুয়া তুলেছি। সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নাকি আনন্দসৃষ্টি; সমাজকল্যাণ, জাতি-গঠন, চারিত্রনির্মাণ প্রভৃতির সঙ্গে নাকি তার কোন যোগ নেই। সমাজ-কল্যাণ ও সৌন্দর্যের সমন্বয়ে যে সাহিত্যের সৃষ্টি, তাতে একদিকে যেমন জাতির প্রাণের ক্ষুধা মেটে তেমনি তার মনের ক্ষুধাও মেটে। বঙ্কিমচন্দ্র তেমন সাহিত্যই সৃষ্টি করে গেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বঙ্কিমের এই যুগ্ম আদর্শ আজকের দিনে আমরা গ্রহণ করি নি। বরং তার দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে আমরা একান্তভাবেই সাহিত্যে আনন্দসৃষ্টির আদর্শকে আশ্রয় করেছি। আজ আর বঙ্কিমচন্দ্রের মত উপন্যাসরচনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-শিল্পের সূত্র নির্দেশ কিংবা সমাজদেহের নানাবিধ ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করবার কথা কারও মনে হয় না; সকলেই সমালোচনার, প্রতিবাদের, বিচারের অপ্রীতিকর দায়িত্ব একপাশে সযত্নে সরিয়ে রেখে সাহিত্যশিল্পকে অবলম্বন করে হৃদয়বৃত্তির চর্চায় মেতে উঠেছেন। এখন বাংলা সাহিত্যে যে-ধারা চলেছে তা একান্তভাবেই শরৎচন্দ্রের রেখাপথ অনুসরণে গড়ে-ওঠা ধারা।

শরৎচন্দ্রের শিল্পের মধ্যে প্রখর মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া না গেলেও, এক ধরনের সমাজকল্যাণের সংস্কার তাঁর মানসিক গঠনের ভিতর সহজাত ছিল। আর কিছু থাকুক আর না থাকুক তাঁর ভিতর সাধারণ মানুষের প্রতি দরদ অপরিমেয় ছিল। এখনকার সাহিত্যে মানবদরদের অভিব্যক্তি খুব সবল রেখায় চিহ্নিত এমন কথা বলা চলে না, কিন্তু হৃদয়চর্চার ঠাটটুকু পুরো মাত্রাতেই বিদ্যমান। মস্তিষ্কচর্চার আদর্শ তথা মননজীবিতাকে আমরা বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনা থেকে কুলোর বাতাস দিয়ে খেদিয়ে দিয়েছি।

আমার মনে হয়, একাধারে মনস্বিতা ও সৃজনধর্মিতার শ্রেষ্ঠ সমন্বয়ের দৃষ্টান্তস্থল বলতে আমাদের সাহিত্যে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রকেই বোঝায়। এই ক্ষেত্রে আজও তিনি একক। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ খুবই যথার্থ যে, "রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।...বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য কি বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি ধর্মগ্রন্থ যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়ে আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা যেখানেই তাঁহাকে আর্তস্বরে আহ্বান করিয়াছে, সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দেখা দিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ অনুধাবন করলে দেখা যায়, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রে এমন একটি গুণের আরোপ করেছেন, যেটিকে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে অনন্য বলা যায়। সেটি হল বঙ্কিমচন্দ্রের "চতুর্ভুজ মূর্তি," তাঁর সর্ববিষয়ে প্রস্তুত থাকার আদর্শ। এ জিনিস আজকের দিনের বাংলা দেশ থেকে একেবারেই হারিয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সমকালীন বাঙালী লেখকদের উপর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বহুমুখী প্রতিভাযুক্ত শিল্পিমানসের রবীন্দ্রনাথ-কথিত বৈশিষ্ট্যের সর্বশেষ সার্থক উদাহরণস্থল রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর থেকেই বাংলা সাহিত্যে ওই সমন্বয়ী আদর্শের চর্চায় দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে ভাটার টান শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও আমরা দেখতে পাই, তাঁর মানসিক গঠনের ভিতর

কবিধর্মিতারই সমধিক প্রাধান্য। গভীর শিল্পপ্রাণতা ও সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে মনস্বিতার সমন্বয় রবীন্দ্রনাথেও ঘটেছে। কিন্তু তাঁর মনস্বিতার জাত আলাদা। সেই মনস্বিতার মধ্যে ধ্যানীর তৃতীয় নয়নের সংস্কারলব্ধ জ্ঞান একটা মস্ত জায়গা জুড়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের মেধা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ তীক্ষ্ণ ছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞা ছিল গভীরতর। রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা আধ্যাত্মিক দৃষ্টির প্রসাদে কখনও কখনও বোধির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রে এ জিনিস আমরা পাই না। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন পুরাপুরি র‍্যাশনালিস্ট ; তার ভাবনাপ্রবাহ বরাবর যুক্তি ও বিচারের খাত বেয়ে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে আমরা মূলতঃ র‍্যাশনালিস্ট লেখক বলতে পারি না, যদিও তাঁর রচনায় যুক্তির পোষকতা কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সব ছাড়িয়ে ছিলেন কবি, তাঁর সেই অতুলনীয় কবি-প্রতিভার ছাপ তাঁর গদ্য পদ্য সকল রচনার গায়েই মুদ্রিত রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির ইতিহাসে এর ভাল মন্দ দুই রকমের ফলই হয়েছে। রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ রোমান্টিকতার (romanticism) খাত বেয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং ওই আদর্শের যা সদ্‌গুণ তাও ওই সূত্রে তার করতলগত হয়েছে। কিন্তু যুক্তির চর্চায় আজকের সাহিত্যের বিশেষ কোন উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায় না। মননশীলতার প্রতি লেখকদের আগ্রহ কম, স্ফূর্তি কম। আর এই স্ফূর্তি তাঁদের মধ্যে নেই বলে তাঁরা সমাজকল্যাণের চর্চায়ও তেমন স্ফূর্তি অনুভব করেন না। এইখানে বলা আবশ্যক যে, যুক্তিচর্চার সঙ্গে জাতিগঠনের প্রশ্নের বিশেষ একটি যোগ আছে। এই যোগ বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রবলভাবে পরিদৃশ্যমান, অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজ আর লেখকবর্গ ওইভাবে ভাবিত নন। তাঁরা মননশীলতা ও যুক্তিচর্চাকে তাঁদের সাহিত্য থেকে প্রায় বরবাদ করেছেন। উনিশ-শতকীয় লেখকদের জীবনে আদর্শবাদ একটা বড় আশ্রয়ভূমি ছিল, বঙ্কিম-সাহিত্যে তো তা একটি প্রধান উপজীব্য। কিন্তু আজ আর আদর্শবাদ লেখকদের তেমন ভাবে অনুপ্রাণিত করে না। জাতিগঠন বা চারিত্রচর্চা তাঁদের কাছে আর তেমন মূল্যবান নয়। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ধারা গ্রহণের ফলে আমরা যুক্তিবাদের সরণি ত্যাগ করে হৃদয়চর্চার পথ ধরেছি। রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞার আদর্শ আমরা নিই নি, অযুত রত্নখণ্ডের মত ছড়ানো তাঁর সুবিস্তৃত প্রবন্ধ-সাহিত্যে যে অমূল্য চিন্তারাজি নিহিত রয়েছে, সেই চিন্তা

আমাদের উচ্চকিত করে নি ; আমরা তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতের লালিত্য আর কমনীয়তাটিকেই মুখ্যতঃ অবলম্বন করেছি। ফলে আমাদের মানসবৃত্তির যতটুকু উন্নতি হওয়ার কথা ছিল তা হয় নি।

এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যের আলোচনা করা যেতে পারে। প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধিবাদের ধারাটির সবিশেষ অনুশীলন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভিতর সৃজনীশক্তির দৈন্য থাকায় তিনি বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী ধারার উপর তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করে যেতে পারেন নি। আজকের দিনের লেখকদের উপর তাঁর যে প্রভাব, তা হল প্রধানতঃ ভাষাভঙ্গীর প্রভাব ; প্রমথ চৌধুরী তাঁদের সৃজনী আবেগ খুব বেশী উদ্রিক্ত করে যেতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। জাতিগঠন ও ব্যক্তিগত চারিত্রচর্চার বিশেষ কোন সংকেত বা ইঙ্গিত তাঁর লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে, তিনি সাহিত্যে ওই দুটি আদর্শের আস্থাশীলতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন "লীলাবাদী" লেখক, অন্ততঃ বিশ্বাসের দিক্ দিয়ে তো বটেই। কাজেই মানসিক গঠনের দিক্ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান ছিল অ-সেতুসম্ভব। এই ব্যবধান আরও দুস্তর হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর অবলম্বিত বহুকথিত "বীরবলী" ঢংটির জন্য। বীরবলী ঢঙ সাম্প্রতিক সমালোচকদের কাছ থেকে অনেক বাহবা পেয়েছে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সেই ঢঙয়ের ভিতর এমন একটি চটুল ফুরফুরেপনা আছে, যা সর্বক্ষণ মনে করিয়ে দেয় ওই লেখক গভীরত্বসন্ধানী ছিলেন না, তিনি বিষয়বস্তুর ওপর-ওপর মাত্র ছুঁয়ে যেতে ভালবাসতেন। কায়দা করে কথা বলার দিকে তাঁর যত ঝোঁক ছিল, সারবান তথা হৃদয়গ্রাহী কথা বলার দিকে তাঁর ঝোঁক তত ছিল না। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও চিত্তের মুক্তির কথা বলেছেন, কিন্তু জাতীয় চরিত্রকে কোন্ কোন্ উপাদানের দ্বারা সুগঠিত করা যায়, জাতীয় মানসকে কী কী ভাবের দ্বারা উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত করা যায়, যে বিষয়ে তাঁর বিশেষ কোন বক্তব্য ছিল বলে মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর পার্থক্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আদর্শবাদ ও সমাজকল্যাণবোধের দ্বারা উজ্জীবিত একজন প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টিধর্মী লেখক, আর প্রমথ চৌধুরী হলেন নিছক বুদ্ধিজীবী কথাভঙ্গীসর্বস্ব একজন সুরসিক বৈঠকী মেজাজের লেখক। প্রমথ চৌধুরী বিদগ্ধ (cultured) সাহিত্যিক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে বৈদগ্ধ্যের উপর-পালিশ যে-পরিমাণ আছে, বৈদগ্ধ্যের সারবস্তুর ঠিক ততটাই অভাব।

প্রবন্ধের বক্তব্য সম্পর্কে একটি কথা উঠতে পারে। আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে সমাজকল্যাণবাদী এবং আধুনিক লেখকবর্গকে লীলাবাদী ও সৌন্দর্যবাদী আখ্যা দিয়েছি। এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কেউ কেউ এই যুক্তিতে আপত্তি করতে পারেন যে, আজকের যুগটাই তো বিশেষ করে সমাজসচেতনতার যুগ, উনিশ-শতকীয় বাংলা সাহিত্যের এটি লক্ষণ ছিল না। আজকে আমরা যাকে 'বামপন্থা' বলি, 'প্রগতিশীলতা' বলি, সমাজতন্ত্রী প্রত্যয় বলি, তা একান্তভাবেই বিশ-শতকীয় যুদ্ধোত্তর কালের দান এবং ওই সকল প্রত্যয়ের সূত্রেই তো সাহিত্যে বিশেষ করে সমাজচেতনা ও সমাজভাবনার প্রবেশ ঘটেছে। তবে আর একালীন সাহিত্যকে সৌন্দর্যবাদী আখ্যা দেওয়া কেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকেই বা বিশেষভাবে সমাজসচেতন আখ্যা দেওয়ার তাৎপর্য কী। বঙ্কিমচন্দ্র তদানীন্তন সমাজতন্ত্রী ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচিত থাকলেও তাঁর আমলে সমাজতন্ত্র কিংবা সাম্যতন্ত্রের তাদৃশ প্রসার হয় নি। তাছাড়া, গোড়ায় সাম্যতন্ত্রের প্রতি আস্থা ঘোষণা করে 'সাম্য' বই লিখলেও পরে বঙ্কিমচন্দ্র সে বইয়ের প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর দ্বারা শেষ অবধি সমাজতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রের প্রতি প্রকারান্তরে তিনি তাঁর অনাস্থাই প্রকাশ করেছেন। এই যদি প্রকৃত অবস্থা হয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্রকে আধুনিক মানদণ্ডে সমাজসচেতন বলবার কী হেতু থাকতে পারে? আধুনিক লেখকেরাই বা লীলাবাদী আখ্যা পান কোন্ যুক্তিতে?

এর উত্তরে বলব, আধুনিক লেখকবর্গ অল্পবিস্তর প্রায় সকলেই বর্তমান প্রবহমান বামপন্থী চিন্তাদর্শের মানদণ্ডে সমাজচেতনার তন্ত্রধারক বটেন, কিন্তু বৃহত্তর বিচারে তাঁরা সমাজসচেতন নন। কুলি-মজুর এবং অন্যান্য নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষদের দুঃখ-বেদনা সম্বন্ধে তাঁদের রচনায় দরদ ও সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সমগ্র ভাবে তাঁরা জাতীয় চরিত্রের উন্নয়নের কথা বলেন না, চরিত্রের সংস্কারের কথা বলেন না, আত্মোপলব্ধির অবশ্য-প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন না। এক কথায়, তাঁরা সাহিত্যের আদর্শবাদী দিকটিকে একপাশে সরিয়ে রেখে শুধুই শ্রেণীগত কল্যাণের আদর্শ প্রচার করেন গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে, তা-ও সময় সময় বিদ্বেষের কালিমার দ্বারা মলিনতাপ্রাপ্ত। এখনকার লেখকদের রচনার মধ্যে যৌথ কল্যাণের কথা হয়তো আছে, কিন্তু যূথ বা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কেন্দ্রভূমিতে আছে যে-ব্যক্তি, সেই ব্যক্তির আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উজ্জীবন সম্পর্কে এখনকার

লেখকেরা প্রায় সঙ্ঘবদ্ধভাবেই নীরব। অর্থাৎ, এখনকার লেখকদের চিন্তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অনুভূমিক (horizontal) গতি অবলম্বন করে চলে, প্রলম্ব (vertical) গতি অবলম্বন করে চলে না। তাঁদের দৃষ্টি ব্যাপ্তির অভিমুখী, উর্ধ্বমুখী নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এই অর্থে খাঁটি সমাজসচেতন লেখক ছিলেন যে, তিনি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের মাধ্যমে আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে একই কালে জাতি-চরিত্রের সংস্কার করতেও চেয়েছিলেন। সব-কিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে ব্যক্তি-মানুষকে স্থাপন করে তিনি সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উজ্জীবন, বিকাশ, সম্ভব হলে রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছেন। সম্প্রদায়ের কল্যাণ তিনি অবশ্যই কামনা করেছেন, কিন্তু তারও উপরে, যে অগণিত-সংখ্যক ব্যক্তির সমবায়ে সম্প্রদায় ও জাতিদেহ গঠিত হয়, সেই প্রতিটি ব্যক্তির উর্ধ্বগতি আকাঙ্ক্ষা করেছেন। ব্যক্তি শোধিত হলে তবে জাতি শোধিত হয় এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসই তাঁর নব-হিন্দুত্ববাদের গোড়ার কথা। তিনি এই বিশ্বাসকে সার্থক রূপ দিয়ে গেছেন তাঁর শেষ বয়সের 'ত্রয়ী' (trilogy) রচনা 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭) উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্র মহত্তর সমাজসচেতন লেখক এই অর্থে যে, তিনি ব্যক্তির কল্যাণের উপর জোর দিয়ে সমগ্রভাবে জাতির কল্যাণের কথা চিন্তা করেছেন, আজকের দিনের তথাকথিত সমাজসচেতন লেখকের মত কেবল মাত্র শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর কল্যাণের কথা বলেন নি। তাঁর সমাজভাবনা গোটা জাতিকে কেন্দ্র করে পরিব্যাপ্ত, তাই তাঁর সাহিত্য অন্যান্য বিচার ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র এই বিচারেও চিরন্তন প্রেরণার উৎস।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে আধুনিক কালের শিল্পী মহলের একটা অভিযোগ এই যে, তিনি নীতিবাদের দ্বারা তাঁর সাহিত্যের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন। তিনি তাঁর উপন্যাসের চিত্র-চরিত্রগুলির বিকাশ শিল্পের নিজস্ব গতিবেগের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নি, তিনি তাঁর সংস্কারক মনের বল্গা তাদের উপর আরোপ করে অনেক সময় তাদের ভিন্নপরিণামমুখী করেছেন। তিনি রোহিণীকে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে বিদ্ধ করে মেরেছেন, কুন্দকে বিষপানে আত্মহত্যা করিয়েছেন, এমন

যে অসমসাহসিকা শক্তিময়ী দেবীচৌধুরাণী, তাঁকে নিরীহ কুলবধূরূপে ব্রজেশ্বরের ঘর-গেরস্থালীর মধ্যে এনে ঢুকিয়েছেন। এ সবই তিনি করেছেন সমাজের প্রয়োজনে, সমাজের মুখ চেয়ে। কিন্তু আর্টের রস এতে ব্যাহত হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর যে একটি ঐকান্তিক নীতি আর আদর্শবাদী সত্তা ছিল, সেই সত্তা প্রবল হয়ে বারে বারেই ঔপন্যাসিকের স্বধর্ম থেকে তাঁকে বিচলিত করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্কে আধুনিক কালের এই সমালোচনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই সমালোচনার মধ্যে যে বেশ কিছুটা সত্য রয়েছে তা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পাদর্শের বৈশিষ্ট্য আর সাহিত্য-সাধনার স্বরূপ বিচার করলে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত এই অভিযোগকে তাঁর স্বপক্ষের একটি গুণও মনে করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র যে কালে সাহিত্য-সাধনায় আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই কালটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। সেই কালের শিল্পগত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এই কালের শিল্পগত ধ্যান-ধারণার বিস্তর ব্যবধান। তাছাড়া, যে কথা গোড়াতেই বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্র তো শুধুমাত্র সাহিত্যিক ছিলেন না, জাতীয় জীবনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনেক বৃহত্তর, মহত্তর। তাঁর মানসিক প্রস্তুতিও ছিল তদনুরূপ। তাঁর ভিতর মনীষা ও রসবুদ্ধির অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছিল। সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ধর্মচিন্তা, শাস্ত্রানুশীলন প্রভৃতি বিদ্যার নানাক্ষেত্রে তাঁর অবাধ সঞ্চরণ ছিল। এমন নানামুখী যাঁর কৌতূহল, এমন সুতীব্র যাঁর ধারণ-ক্ষমতা, তিনি সঙ্কীর্ণ সাহিত্যসাধনায় আবদ্ধ হয়ে থাকবেন এটা আশা করা যায় না। তিনি তাঁর সহজাত প্রতিভা আর অর্জিত শক্তির দ্বারা নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই জাতির চালকের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় তাঁর দেশপ্রেমকে উচ্চকিত করেছিল, বিদেশী সমাজতান্ত্রিক চিন্তার নিবিড় অনুশীলন তাঁর সমাজসংস্কার-কামনাকে সঞ্জীবিত করেছিল। এর সঙ্গে এসে মিশেছিল ইতিহাস-চেতনা, বাঙালীর অতীত ইতিহাসের গৌরববোধ। এ সকল নানা কারণ একত্রিত হয়ে, মিশ্রিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিছক সাহিত্যশিল্পীর কোঠায় ধরে না রেখে তাঁকে অনেক বড় ভূমিকায় নিক্ষেপ করেছিল। সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁর পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শিল্পের দাবি পূরণ সব সময় সম্ভব হয় নি, শিল্প রচনাকালে তাঁকে সমাজের বৃহত্তর প্রয়োজনের কথাও মনে রাখতে হয়েছে। তিনি যত বড়

শিল্পী ছিলেন তত বড়ই মনীষী ছিলেন। বোধ করি খতিয়ে দেখতে গেলে, তাঁর মনীষা তীক্ষ্ণতর ছিল। বাংলা সাহিত্যে এত বড় মনীষাসম্পন্ন লেখক দ্বিতীয় আর আবির্ভূত হন নি। এ কথা বললে আশা করি অন্যান্য দিক্‌পাল-দের প্রতি অবিচার করা হয় না। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় যদি সমাজ-সংগঠন কামনার কিঞ্চিৎ আধিক্য ঘটে থাকে তাকে বোধ করি তেমন দোষাবহ মনে করা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকৃতির মানদণ্ডে বিচার করলে আধুনিক যুগেরই বরং অনেক অপূর্ণতা চোখে পড়ে। এখনকার কালের সাহিত্যরচনায় প্রজ্ঞার ছাপ বড় একটা চোখে পড়ে না। বিদ্যানুশীলনের ঐকান্তিক আগ্রহের দ্বারা এ সাহিত্য অনুপ্রাণিত নয়। আজকালকার লেখকগণ সাহিত্যকে যেন বড্ড বেশী রম্যতাচর্চার ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। এ সাহিত্যে লালিত্য আর কমনীয়তারই প্রাধান্য—মননের ঋজুতা আর দার্ঢ্য যেন আজকের সাহিত্য থেকে প্রায়-অন্তর্হিত হয়েছে। অধিকাংশ শিল্পীই আনন্দসৃষ্টির আদর্শটিকে বিধিমতে অনুসরণ করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাঁদের আনন্দচর্চার মধ্যে কল্যাণচিন্তার অংশ কম। বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা আজ আকাশে-বাতাসে ছড়ানো, অথচ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে তার কোন গভীর, সার্থক প্রতি-ফলন নেই। যে আদর্শবাদী প্রণোদনা থাকলে চিন্তাকে রচনার মধ্যে রূপ না দিয়ে স্বস্তি পাওয়া যায় না এবং যে আদর্শবাদ বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে পুরা-মাত্রাতেই ছিল, সে-জাতীয় আদর্শবাদের একান্তই আজ অভাব দেখা দিয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মননশীলতার একটা ঢঙ মাত্র আছে, সত্যিকার মননশীলতা নেই। আরও যেটা ভয়ের কথা, জীবন থেকে শিল্প বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাস্তববাদের ঢক্কানিনাদে কান পাতা দায়, অথচ সত্যিকারের বাস্তববাদী সাহিত্য খুব বেশী লেখা হচ্ছে এমন কথা বলা যায় না। তা যদি হত জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এমন বিচ্ছেদ ঘটত না।

বেশ বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এ যুগের লেখকদের উপর বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হয়েছে। এই অপরিসীম প্রতিভাশালী প্রজ্ঞাবাদী লেখক বাংলা সাহিত্যে যে যুক্তিনিষ্ঠা ও মননশীলতার সংস্কার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, পরবর্তী কালের লেখকগণ সেই ধারা গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর পর থেকে বাংলা সাহিত্যে মননশীলতার প্রভাব ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এসেছে। যুক্তিবাদের বদলে এক ধরনের ভাবাবেগসর্বস্ব ফাঁপা মনো-

বিলাস সৃজনাত্মক প্রয়াসের আবরণে লেখকদের চিত্ত অধিকার করে বসেছে। সমাজ-সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সবিশেষ উৎসাহ ছিল, আজকের খুব কম লেখকের মধ্যেই এমনতর উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক কালের সাহিত্য বিদ্যাবর্জিত, সুতরাং তার জোরও সেই পরিমাণে কম। বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর আমরা পাই রস ও জ্ঞানের অঙ্গাঙ্গী সম্মেলন, এখনকার লেখকগণ জ্ঞানের আদর্শ বরবাদ করে একান্তভাবেই রসের দিকে ঝুঁকেছেন বলে মনে হয়। ফলে সাহিত্যসৃষ্টির যে একটা লোকহিতকর গঠনমূলক দিক্ আছে সে দিক্‌টা এ যুগে কোনমতেই জোরালো হয়ে উঠতে পারছে না।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা চিন্তা করবার আছে। (বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সব্যসাচী। সাহিত্যের একাধিক বিভাগে তিনি সমান স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে সঞ্চরণ করেছেন। তিনি যেমন সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন, তেমনি সাহিত্য-সৃষ্টির সূত্রাবলীও নির্দেশ করে গেছেন। বঙ্গ-সাহিত্যের সংগঠনেরও ভার তিনি নিয়েছিলেন। এই স্বজাতিবৎসল লেখক গভীর কল্যাণাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত একজন শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সমাজে ও সাহিত্যে যা কিছু অমঙ্গলকর ও ক্ষতিকারক, তাকেই তিনি ঝেঁটিয়ে দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। অর্থাৎ বঙ্কিম শুধুই সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন না, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কর্মীপুরুষও ছিলেন। বঙ্কিমের প্রতিভার নানামুখীনতার তত্ত্ব না নিলে বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের প্রতি অবিচার করা হয়।)

আধুনিক কালের লেখকগণ এই বিচিত্রপথগামিতার আদর্শ থেকে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবেই ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন। এ যুগ হচ্ছে স্পেশালাইজেশনের যুগ, একটি মাত্র কর্মে আবদ্ধ ও তৃপ্ত থাকবার যুগ। যিনি কবিতা লেখেন তিনি শুধুই কবিতা লেখেন, যিনি কথাসাহিত্যে উৎসাহী তিনি শুধুই কথাসাহিত্যের কারবারী, যিনি প্রবন্ধ-নিবন্ধের লেখক প্রবন্ধ-নিবন্ধের বাইরে তাঁকে মাথা গলাতে বড় একটা দেখা যায় না। শুধু সাহিত্যের কথাই বা বলি কেন, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে এই একচক্ষু খণ্ডিত প্রয়াসের আদর্শ আসর জাঁকিয়ে বসেছে। সবাই আমরা স্পেশালাইজেশনের ক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে বসে আছি। অবশ্য এ রকম ঘটবার নানা কারণ আছে, প্রধান কারণ অর্থনৈতিক দুর্গতির চাপে ব্যক্তিত্বের সংকোচন, তবে স্বাভাবিক শক্তির অভাবও যে এই অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

তবে আধুনিক যুগের আর একটি দিক্ আছে, সে ক্ষেত্রে বিস্তর অগ্রগতি

সাধিত হয়েছে। এখনকার কালের প্রবক্তাগণ সংস্কারমুক্তি আর ঔদার্যের দিক্ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে এসে থেমেছিলেন সেখান থেকে অনেক দূর পথ এগিয়ে গেছেন। (বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর এক ধরনের রক্ষণশীলতা ছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। নব-হিন্দুত্বের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দান করতে গিয়ে তিনি তৎকালীন প্রগতিশীল আদর্শগুলিকে প্রথমে স্বীকার করে নিয়েও শেষ পর্যন্ত তা থেকে পেছিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর 'সাম্য' গ্রন্থের প্রচার তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে সর্বগুণাধার আদর্শ চরিত্ররূপে কল্পনা এবং তাঁর উপর ভগবানের অবতারত্ব আরোপ করতে গিয়ে এত বড় বিদ্বান যুক্তিধর্মী লেখক নিজেই বোধ হয় যুক্তিবাদের সরণি থেকে কিছু-পরিমাণে স্খলিত হয়ে পড়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কারস্পৃহা মাঝে মাঝে তাঁর পাণ্ডিত্যকেও পরাস্ত করেছে।)

সে যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও জীবনাদর্শ থেকে এ কালের মানুষ আমরা, আমাদের অনেক কিছু গ্রহণ করবার আছে। সবচেয়ে যেটি গ্রহণীয় তা হল, উনিশ শতকের ওই প্রধান পুরুষের ঋজু মনস্বিতা ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। রসরসিকতার সঙ্গে মনস্বিতার সংযোগে বঙ্কিমচন্দ্র যে অখণ্ড জ্ঞানসাধনার আদর্শ বাঙালী জাতির মধ্যে প্রচার করতে চেয়েছিলেন সেই আদর্শটিকে যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি তা হলে আমাদের বঙ্কিমস্মৃতিপূজা সার্থক।

সাহিত্য ও মধ্যবিত্ত মানসিকতা

ইংরেজ আমলে শহর-জীবনকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, এ তথ্য সকলেই জানেন। এ শ্রেণীর মানুষেরা ছিলেন বৃত্তিজীবী, কোন-না-কোন বৃত্তিকে অবলম্বন করে তাঁদের জীবিকার সংস্থান হত। দেশের গাঁয়ে এঁদের কারও জমিজমা ছিল, কারও ছিল না, তবে শহর-জীবনের নানাবিধ কর্মের সূত্রেই যে এঁদের আয়ের একটা মোটা অংশ অর্জিত হত তাতে সন্দেহ নেই। বৃত্তিতে এঁরা ছিলেন নগরনির্ভর, মনোভাবেও বটে। উকিল, ডাক্তার, কেরানী, আপিসপরিচালক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, দোকানপরিচালক, দালাল, ঠিকাদার প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের কর্মীর দ্বারা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কলেবর গড়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও বৃত্তির তারতম্য অনুযায়ী এঁদের উপার্জনের তারতম্য ছিল, তবে মোটামুটি ভাবে এই শ্রেণীটিকে আমাদের দেশের অর্থনীতির মানদণ্ড অনুসারে সচ্ছল বললে বোধ করি কিছু অন্যায় বলা হয় না। আর যাই হোক, তৎকালীন কৃষিজীবী অথবা শ্রমজীবীর তুলনায় তাঁদের জীবনযাত্রা যে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ওই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জের এখন পর্যন্ত চলেছে। নানাবিধ কারণে—দেশের রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন দুটি মুখ্য কারণ—বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পূর্ব-প্রতিপত্তি আর নেই, তবে শ্রেণী হিসাবে তার অস্তিত্ব অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ আছে এবং কোন-একটা গভীর ঝাঁকুনির ফলে সামাজিক বিন্যাসের আমূল রূপান্তর না হওয়া পর্যন্ত যে এই শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে তাতেও সংশয় প্রকাশের কারণ নেই।

কিন্তু মধ্যবিত্তের সৃষ্ট সাহিত্যের আয়ু আর কতদিন? এ সাহিত্যের ধারাধরন ভাবভঙ্গি বদলাবার সময় কি আসে নি? যে সামাজিক পরিস্থিতিতে এ দেশে মধ্যবিত্ত মানসিকতা নামক একটি বিশেষ মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছিল, সে পরিস্থিতির বদল হয়েছে। মধ্যবিত্তের সযত্নলালিত মনোভাবের উপর চার দিক্ থেকে আঘাতের পর আঘাত এসে পড়ছে। আঘাতের প্রক্রিয়া কখনও সূক্ষ্ম কখনও স্থূল, তবে আঘাত-চিহ্নগুলিকে চিনতে ভুল হওয়ার যো নেই। এতাবৎ-অনাদৃত তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীগুলি জেগে উঠছে, এই লক্ষণ নিতান্ত স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায়

কৃষকশ্রেণীর যে পরিমাণে লাভ হয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সে পরিমাণে স্বার্থহানি হয়েছে। নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে অবশ্য এ স্বার্থহানি পরোক্ষ, তবে যেহেতু পরগাছা জমিদার শ্রেণীর মানুষগুলির প্রতি এই শ্রেণীর স্বাভাবিক একটা মনের টান ছিল, জমিদারী রদ হওয়ায় সে অশোভন পক্ষপাত প্রচণ্ড একটি ঘা খেয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকলেই যে পূরাপূরি নগর ও বৃত্তি-নির্ভর তা নয়। আমি পূর্বেই বলেছি, এঁদের কারও কারও দেশে জমি-জায়গা আছে এবং তা থেকে কিঞ্চিৎ আয়ের উপায়ও এ যাবৎ হয়ে এসেছে। ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে এঁরা স্বার্থসূত্রে সম্পর্কিত ছিলেন। কংগ্রেস-প্রবর্তিত জমিদারী বিলোপ আইন চরমপন্থীদের বিবেচনায় যতই ত্রুটিযুক্ত হোক এবং খারিজ জমিদারদের ক্ষতিপূরণদানের বিধিটি সম্পর্কে মহলবিশেষের যতই আপত্তি থাকুক, এ বিষয়ে আশা করি সকলেই একমত হবেন যে, কংগ্রেসের ওই চেষ্টার ফলে জমিতে মধ্যস্বত্ব বিলোপের নীতি সর্বাংশে কার্যতঃ প্রযুক্ত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় জমিদাররাই যে শুধু আহত হলেন তাই নয়, তাঁদের তল্পীবাহক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশের উপরও পরোক্ষে মার এসে লাগল। আইনপ্রণয়নকারীদের মনোগত অভিপ্রায় যাই হোক, আইনটি প্রচলিত হওয়ায় দেশের সামাজিক কাঠামোর যে মস্ত বড় একটি পরিবর্তন ঘটল এ সত্য স্বীকার করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

বাংলা সাহিত্যের উপর এই পরিবর্তিত অবস্থার প্রভাব প্রতিফলিত না হয়েই যায় না। আগে থেকেই মধ্যবিত্ত মানসিকতায় ভাঙন ধরতে শুরু করেছিল, এখন সে ফাটল আরও বিস্তৃত হল। এতাবৎ-নির্যাতিত-শোষিত শ্রেণীগুলি যে পরিমাণে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সে পরিমাণে নীচে নেমে যাচ্ছে। কবে এ সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পূরাপূরি অবস্থাসাম্য ঘটবে বা আদৌ ঘটবে কি না সে কথা কেউ বলতে পারে না। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে পূর্বের ন্যায় বহাল-তবিয়তে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, মধ্যবিত্তের মহিমা যত উচ্চ নাদেই কীর্তন করি না কেন, তার ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ নয়। আমরা চাই আর না চাই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা স্পষ্ট।

এই যদি বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা হয়, তা হলে কেন আমরা আজও ঘুনে-ধরা মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তিকে আঁকড়ে থাকব? প্রকৃত প্রস্তাবে, বাঙালী লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ আসন্ন

বলে মনে হয়। এই পরিবর্তনের চেতনা যে-লেখকের ভিতর যত স্পষ্ট হয়ে উঠবে সে-লেখক তত বেশী পরিমাণে যুগধর্মের দাবির প্রতি সুবিচার করবেন। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে এই দাবির অলঙ্ঘনীয়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি এই অকপট স্বীকারোক্তি করতে পেরেছিলেন যে,

"আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।"

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই স্বীকারোক্তি ও প্রত্যাশা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। যাকে প্রচলিত অর্থে মধ্যবিত্ত মানসিকতা বলা হয়, রবীন্দ্রনাথ সে মানসিকতার কবি ছিলেন না। বস্তুতঃ, কোনও প্রকার শ্রেণীচেতনার দ্বারা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে চিহ্নিত করতে গেলে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও ব্যক্তিত্বের অযথার্থ পরিচয় দান করা হয়। জমিদারী ব্যবস্থার আওতায় রবীন্দ্রনাথের মানসিক জীবন গড়ে উঠলেও এবং অভিজাত চিত্র-চরিত্র রবীন্দ্র-উপন্যাসের মূল উপজীব্য হলেও অপরিসীম কল্পনাশক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত আভিজাত্যের ও বনেদিয়ানার গণ্ডী অতিক্রম করেছিলেন। ব্যক্তিজীবনে জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত অনর্জিত সম্পদ তিনি ভোগ করেছেন এবং তার ফলভাগীও হয়েছেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্যে অনর্জিত সম্পদ ভোগের আদর্শ কোথাও তিনি বড় বলে তুলে ধরেন নি। রবীন্দ্রনাথ শ্রেণীর কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন শ্রেণী-নিরপেক্ষ মানবিকতার কবি। মানুষ ও প্রকৃতি এই দুই মৌলিক সত্তা রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাদের দেশকালনিরপেক্ষ মহিমান্বিত সনাতন রূপে প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওই সার্বভৌম ও সার্বকালিক মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবার সাধনাতেই তাঁর কল্পনা বিচিত্রপথগামী হয়েছে, 'নিখিলের সংগীতের স্বাদ' প্রসাদ লাভ করে তিনি 'পৃথিবীর কবি' হয়ে উঠেছেন।

এমন যে সর্বব্যাপী রবীন্দ্রনাথ, তিনি পর্যন্ত তাঁর কল্পনার বিস্তৃতিতে তৃপ্ত হন নি, তাকে বিস্তৃততর করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেই যদি এই কথা হয়, তবে আমাদের দেশের গড়পরতা ক্ষমতাযুক্ত অতিমাত্রায় শ্রেণীসচেতন সাধারণ মধ্যবিত্ত লেখকদের সম্পর্কে সে কথা আরও কত বেশী খাটে

তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। মধ্যবিত্ত সমাজের মত আত্মতৃপ্ত, আহ্লাদে সমাজ আর দুটি নেই। এই সমাজের মানুষের ধারণা, সমস্ত জগৎ-সংসারের সুখ-দুঃখ এঁদেরই কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। অভিজাত সমাজের এঁরা তোষণকারী, নির্যাতিত-শোষিত শ্রেণীগুলির প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ। আবার সুযোগ দেখা দিলে, নির্যাতিত-শোষিতের প্রেমিক হয়ে অভিজাতদের কোণঠাসা করতেও এঁদের আটকায় না। মধ্যবিত্ত মানুষের চেতনা সর্বদাই আপেক্ষিক ও তুলনানির্ভর। স্বশ্রেণীর বৈষয়িক সুবিধা-অসুবিধার ধারণা অনুযায়ী এঁদের আপেক্ষিকতার মানের বদল হয়ে থাকে। তুলনার সাহায্য না নিয়ে এঁরা বস্তু কিংবা মানুষের বিচার করতে পারেন না। হয় কোন বস্তু অন্য বস্তুর চাইতে ভাল কিংবা মন্দ—এই তাঁদের বস্তুবিচারের পদ্ধতি। এবং ওই পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁদের পক্ষপাতেরও ক্ষেত্র বদল হয়ে থাকে। আজ যে উপরে আছে সে নীচে নেমে গেলে মধ্যবিত্ত মানসিকতারও সেই সঙ্গে আনুপাতিক পরিবর্তন ঘটে। যে-কোন সত্তাকে তার স্ব-স্বরূপে বিচারের ক্ষমতা আর কোন সম্প্রদায়ের আছে কি না জানি না, তবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেই সে কথা নিশ্চিত। মানুষের এক মাত্র পরিচয় সে মানুষ, তার শ্রেণী নেই গোত্র নেই বড়-ছোট নেই দেশ নেই—এই-যে মৌলিক মানবত্বের ধারণা, এই একান্ত সুস্থ আদর্শের অনুশীলন আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের নরনারীর মধ্যে আশানুরূপ মাত্রায় হলে আজ মধ্যবিত্ত মাসসিকতার অপূর্ণতা নিয়ে আক্ষেপ করতে হত না।

আমি আমার এক প্রবন্ধে পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে নাগরিক সাহিত্যের আদর্শটিকে সমর্থন করেছিলাম। মধ্যবিত্ত মানসিকতার সঙ্গে নাগরিক মনোভাবের নিকট-সম্পর্ক। মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেহেতু বৃত্তিনির্ভর শ্রেণী, সেই হেতু নগরনির্ভর শ্রেণীও বটে। তা যদি হয়, মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতি এই বিমুখতা কেন। যে সাহিত্যে মধ্যবিত্ত মানসিকতা প্রতিফলিত হয়, সে সাহিত্য আকারে প্রকারে নাগরিক হতে বাধ্য। নাগরিক সাহিত্যের পোষকতা করে তার পরেই যদি মধ্যবিত্ত মানসিকতার খণ্ডনমূলক যুক্তি প্রদর্শন করতে হয়, সে যুক্তির ভিতর স্বতোবিরোধের দোষ বর্তায় না কি?

অভিযোগটি বিচার করে দেখবার প্রয়োজন আছে। যুক্তির আপাত-সারবত্তাকে কাঁচিয়ে তোলবার পক্ষে স্বতোবিরোধের তুল্য বিচ্যুতি নেই।

চিন্তার যাঁরা কারবারী তাঁদের প্রতি পদে এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। রচনার সৌকুমার্য অপেক্ষা যুক্তির অকাট্যতার প্রতি তাঁদের মনোযোগ দিতে হয় বেশী, নয় তো বক্তব্যের মূল্য থাকে না। সামান্য অসতর্কতায় বিরাট-বিশাল একটি যুক্তির প্রাকার যে-কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে—এমন দৃষ্টান্ত চিন্তা-সাহিত্যে বিরল নয়। সুতরাং নাগরিক সাহিত্য বনাম মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রশ্নটির উপর বিশ্লেষণী-দৃষ্টি ন্যস্ত করা যেতে পারে।

সত্য বটে আমরা নাগরিক সাহিত্যের পরিপোষক, কিন্তু এখন পযন্ত বাংলা সাহিত্যে যে-জাতীয় নাগরিকতার প্রতিফলন ঘটেছে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া চলে না। কথা-সাহিত্যে, কাব্যে অথবা নাটকে সেই নাগরিক সাহিত্যকে আমাদের রূপ দিতে হবে, যে সাহিত্যে নগরের আত্মার রূপটি উদ্‌ঘাটিত; এখন পর্যন্ত যা হয়ে এসেছে তা নগরের বহিরঙ্গের চিত্রণ ছাড়া কিছু নয়। নগরজীবন অতিশয় জটিল। এর পরতে পরতে পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দ সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য গায়ে-গায়ে জড়িয়ে আছে। আধুনিক যুগোচিত মিশ্র মননক্রিয়ার মন্থনদণ্ডের দ্বারা নাগরিক জীবনের বারিধিতে আমরা যে আলোড়ন সৃষ্টি করছি, তাতে গরল ও অমৃত দুই এক সঙ্গে উঠে আসছে। দেবাসুরের সংগ্রামে নগরজীবন দলিত-মথিত। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির ধরনে এ দেশে শিল্প ও ধন-তন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নগরজীবনের এক দিকে জমে উঠেছে পুঞ্জীভূত ক্লেদ গ্লানি বিলাস-ব্যসনের সমারোহ, অন্য দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ হাহাকার। এক দিকে পর্বতপ্রমাণ আড়ম্বর ভোগৈশ্বর্য ধনগরিমা, অন্য দিকে অতলস্পর্শী দুঃখ দৈন্য শূন্যতা। এক দিকে অস্তি (haves), অন্য দিকে নাস্তি (have-nots)। সেই শিল্পীই হলেন শ্রেষ্ঠ নাগরিক শিল্পী, যিনি নগরজীবনের এই শুভাশুভ-মিশ্রিত দ্বৈত রূপটিকে তার পরিপূর্ণ মহিমায় উদ্‌ঘাটন করতে জানেন। সাহিত্যে আমরা নগরজীবনের বিবিধ প্রকরণাদির খুঁটিনাটি বর্ণনা চাই না, চাই নগরের মনোময় রূপের সুষ্ঠু শিল্পসম্মত প্রকাশ।

পরিতাপের বিষয়, এই প্রকাশ এখনও বাংলা সাহিত্যে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে নি। এতাবৎ যারা নগরজীবনের চিত্র-চরিত্র রচনা করেছেন তাঁদের অধিকাংশই নাগরিকতার বহিরঙ্গকে মাত্র ছুঁয়ে গেছেন; নগরের আত্মার গহনে প্রবেশ করে নগরের প্রকৃত রূপটিকে জানার বা চেনার সুযোগ তাঁদের হয় নি। তাঁরা সব আধা-খেঁচড়া নাগরিকতার মানস-সন্তান, তেমনি তাঁদের সাহিত্যও আধা-খেঁচড়া নাগরিকতার বার্তাবাহক মাত্র। আধুনিক যুগোচিত

নাগরিক জীবনকে চিত্রিত করতে হলে, অর্থাৎ ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তী কালে যে বিশেষ চেহারার নাগরিক জীবন দেশে দেশে গড়ে উঠেছে তাকে সাহিত্যের ভিতর সম্যক্ রূপায়িত করতে হলে, শিল্পীর নিজ জীবনে মিশ্র মননক্রিয়ার অভিজ্ঞতা থাকা চাই। জাফরি-কাটা জালের আলো-আঁধারিময় প্রতিবিম্বের মত পাপপুণ্য শুভাশুভ সু ও কু নিয়ে এই জটিল মননক্রিয়া। অস্তি-নাস্তির চেতনা তার ভিতর স্বতঃই অনুস্যূত। যে শিল্পী যুগপৎ নগরজীবনের বিষামৃত পান করেন নি, নিজ জীবনে যথার্থ নাগরিকজন-সুলভ বিচিত্র সূক্ষ্ম-জটিল অভিজ্ঞতার শরিক হন নি, তাঁর পক্ষে আধুনিক নগরচিত্রণের আশা দুরাশা মাত্র। প্রকৃত নাগরিক শিল্পীর পক্ষে নগরের বাহ্যিক ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করাই যথেষ্ট নয়, তাদের তাৎপর্যটুকুও অনুধাবন করা দরকার। নাগরিক শিল্পী ঘটনাতেই শুধু বাঁচেন না, মনেতেও বাঁচেন। মনেতেই বিশেষ করে বাঁচেন। নগরের আত্মিক রূপ পরিস্ফুটনেই তাঁর সমধিক স্ফূর্তি।

এই মানদণ্ড প্রয়োগ করলে দেখতে পাব, আমাদের সাহিত্যে কিছুকাল আগে পর্যন্তও নাগরিক সাহিত্যের সংজ্ঞা অনিরূপিত ছিল। 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক সময়ে এই কলকাতা শহরেই এক নাগরিক শিল্পী-গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। কিন্তু প্রকৃত নাগরিকতার এঁরা সামান্যই চর্চা করেছেন, নাগরিকতার ফ্যাশানটুকু মাত্র এঁরা আয়ত্ত করেছিলেন। এঁদের চোখে নাগরিকতা আর বিজাতীয়তা সমার্থক ছিল। ইংরেজী শিক্ষার খাত-বেয়ে-আসা এক ধরনের কৃত্রিম আধুনিকতার দ্বারা অন্তিম পর্যায়ের 'ভারতী'-গোষ্ঠীর লেখকগণ তাঁদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু এঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, দেশের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যোগ না রেখে নিছক বৈদেশিক আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টি করতে যাওয়ার মত মূঢ়তা আর নেই। বাংলা কথা-সাহিত্যে মণিলাল গঙ্গো, চারু বন্দ্যো, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্র-মোহন, 'রমলা'র লেখক মণীন্দ্রলাল বসু প্রমুখ লেখকগণ যে ধারার রচনার সূত্রপাত করেছিলেন তার উপর নাগরিকতার লক্ষণচিহ্নাদি বাহ্যতঃ ছিল বটে, কিন্তু ভোগসর্বস্ব নাগরিকতার উপর অতিরিক্ত ঝোঁক ন্যস্ত হওয়ার ফলে এঁদের সৃষ্ট সাহিত্য কখনও সত্যকার নাগরিক সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে নি। এঁরা মধ্যবিত্ত সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, নাগরিক সাহিত্য নয়। এঁদের সাহিত্যে নগরজীবনের বিবিধ-বিচিত্র paraphernaliaর বর্ণনা আছে, কিন্তু

আত্মার চিত্রণ অনুপস্থিত। চারু-মণি-হেমেন্দ্র-সৌরীনদের নায়ক-নায়িকাদের জীবনে ছুটি এবং ছুটির আনন্দ লেগেই আছে। বর্ণিত নায়ক-নায়িকারা কলকাতায় বিলাস-যাপনে অভ্যস্ত, প্রত্যেকেরই মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স আছে, ছুটি যাপন করতে হলে অবধারিত ভাবে এঁদের সাঁওতাল পরগণা ও ছোট-নাগপুরের অধুনা-অনাদৃত স্বাস্থ্যাবাসতুল্য শহরগুলির দিকে চোখ পড়ে। এঁরা মোটরে মিহিজাম,কার্মাটার, মধুপুর, গিরিডি, দেওঘর, কোডার্মা, শিমূলতলা, রাঁচী, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল চষে বেড়ায়, দেখামাত্র প্রেমে পড়ে, মোটর-ভ্রমণকালে সঙ্গে থাকে ফ্লাস্কে গরম পানীয়, টিফিন-ক্যারিয়ারে বিচিত্র ভোজ্য বস্তু, উপকরণের মধ্যে বর্ষাতি গগল্‌স্ বাইনোকুলার ক্যামেরা রাইডিং স্যুট বেদিং স্যুট ইত্যাদি এবং মনি-ব্যাগে যে-কোন অঙ্কের ব্যয়ের উপযুক্ত প্রভূত পরিমাণ টাকা। এ সকল মানুষ কেউ খেটে খায় না, কোথা থেকে এঁদের আয় আসে বোঝা যায় না। প্রেমের ফষ্টিনষ্টি ছাড়া এঁরা জীবনে কিছু বোঝে না। অথচ এ-জাতীয় মেরুদণ্ডহীন নরনারীর চিত্রণের দ্বারাই 'ভারতী' সাহিত্যের পাতা মুখ্যাংশে পূর্ণ। এ সাহিত্যকে নাগরিক সাহিত্য বলতে আমাদের দ্বিধা আছে, মধ্যবিত্ত সাহিত্য বললেই এর খাঁটি পরিচয় দেওয়া হয়।

'ভারতী' গোষ্ঠীর এই-যে মধ্যবিত্ত সংস্কার, এই সংস্কারটিই অব্যবহিত পরবর্তী কালে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় পুনরায় আকার লাভ করে। এঁরাও সব কপট নাগরিকতার উপাসক ছিলেন। নাগরিকতার অনুশীলনের নামে এঁরা আসলে অসার মধ্যবিত্ত মানসিকতার পায়েই গড় করেছেন। ইংরেজী ভাবধারার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে এঁরা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের নিকট একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এঁদের সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য ভাব যত উগ্র মাত্রায় প্রকট, স্বদেশীয় চেতনা ঠিক ততটাই অনুপস্থিত। নির্যাতিত-শোষিতের প্রতি এঁদের দরদ কমবেশী লোক-দেখানো, ব্যক্তিজীবনে এঁরা মানবপ্রীতির চর্চা করতেন কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ, অকৃত্রিম মানবপ্রীতির অভিষেকে চিত্ত নিষিক্ত হলে রচনায় যে আন্তরিকতার ছোঁয়াচ লাগে, সেই কল্যাণস্পর্শ থেকে 'কল্লোল'-সাহিত্য দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাবেই বঞ্চিত ছিল। একমাত্র শৈলজানন্দের রচনাকে এই উক্তির ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। অন্যদিকে বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মনোজ-মানিক প্রমুখ 'কল্লোলে'র সমসাময়িক ভিন্ন ধারার লেখকগণ দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পল্লীকেন্দ্রিক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের আর যে অপূর্ণতাই থাক্ তাঁদের ভিতর আন্তরিকতার

অভাব আছে এমন অপবাদ তাঁদের অতি বড় শত্রুতেও দেবে না। বিশেষ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর মানবপ্রেমের আদর্শের দুই শ্রেষ্ঠ প্রতীক। কিন্তু 'কল্লোলে'র লেখকদের ওই মূলেই ছিল গলদ। আপাত-নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে সাহিত্যে আবাহন করতে গিয়ে তাঁরা প্রায়শঃ ভঙ্গির পাদমূলে অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন ; বিশ্বাসের সত্যকে সাহিত্যের সত্যে পরিণত করে তুলতে তাঁদের স্বভাবের বাধা ছিল।

ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শপ্রভাবে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে এক ধরনের ইঙ্গবঙ্গীয় মানসিকতার জন্ম হয়েছিল, যার অভিপ্রকাশ ঘটেছে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর 'ভারতী'তে, 'কল্লোলে' এবং এতদ্ভিন্ন আরও দুই-একটি ধারার রচনায়। এই ইঙ্গবঙ্গীয় সংস্কারের সহিত তথাকথিত মধ্যবিত্ত মানসিকতার যোগ নিগূঢ়। বিবিধ বৃত্তি বা জীবিকাকে অবলম্বন করে মধ্য-বিত্তের জীবনে যে সচ্ছলতা আর স্বাচ্ছন্দ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই সচ্ছলতা আর স্বাচ্ছন্দ্যই এই ইঙ্গবঙ্গ মনোভাবের প্রাণশক্তি জুগিয়েছে। এ জিনিসে আর উনিশ শতকের ইঙ্গবঙ্গ আন্দোলনে বিস্তর পার্থক্য আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর 'নব্যবঙ্গ'পন্থী যুবকগণ ডিরোজিও আর রিচার্ডসনের প্রভাবে প্রকাশ্যে সাহেবিয়ানার চর্চা করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের ওই বিপথগামিতার মধ্যেও একটা আদর্শের প্রণোদনা ছিল। হোক সে আদর্শ ভ্রান্ত-বিকৃত, তবুও তা আদর্শ ছাড়া কিছু নয়। কেন না ভাবের যে প্রাবল্যের বশে তাঁরা স্বদেশীয় রীতিনীতি পরিহার করেছিলেন, ঠিক ততটা প্রবলতা নিয়েই তাঁরা বিদেশী জীবনযাত্রার আদর্শ আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাঁদের বিজাতীয় আচার ও আচরণ প্রতিক্রিয়া-মুখে জন্মলাভ করেছিল বলে তার ভিতর মাত্রাতিরিক্ত আবেগ, প্রয়োজনাতিরিক্ত বেগ দেখা দিয়েছিল। তাঁরা শালীনতা ও শোভনতার গণ্ডী অতিক্রম করেছিলেন বিজাতীয় আচার-আচরণের প্রতি আসক্তির বশে ততটা নয় যতটা বিদ্রোহী মনোভঙ্গীর প্ররোচনায়। হোক মিথ্যা হোক ভুল, পিছনে বিদ্রোহের পোষকতা না থাকলে বোধ হয় কোন গোষ্ঠীর পক্ষেই তৎকালে গোলদীঘির ধারে বসে সর্বজনসমক্ষে মদ্যপান কিংবা গোমাংস ভক্ষণ সম্ভব ছিল না। তৎকালীন নব্যবঙ্গীয়রা বিকৃত জীবনাদর্শের প্রতি মোহবশতঃ ভ্রষ্টাচার হয়েছিলেন, তবে যখন আত্মস্থ হয়েছেন তখন তাঁদের কারও কারও দ্বারা সমাজের ও সাহিত্যের বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হয়েছিল। মাইকেল মধুসূদনের দৃষ্টান্ত এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

বিশ শতকের নবজাগ্রত ইঙ্গবঙ্গ সংস্কার সম্পর্কে এই বিশ্লেষণ খাটে না। এ সংস্কারের পিছনে আদর্শবাদের প্রেরণা সামান্য, পরন্তু আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের মোহ প্রবল। এই নূতন ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকবার চূড়ান্ত সার্থকতা সচ্ছলতায় ও ভোগবাদে। আরাম-আয়েসে অধিষ্ঠিত আয়মসৃণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বাইরে এঁদের দৃষ্টি আদপেই পৌছতে চায় না। শহর-জীবনের করণকারণ ধরনধারণ এঁদের যে পরিমাণ আয়ত্তে, পল্লীজীবন ঠিক সেই অনুপাতে এঁদের চেতনায় অনুপস্থিত। শহরের মেখলায় বসবাসকারী শ্রমিকদের জীবনযাত্রা সম্পর্কেও এঁদের কোন জ্ঞানগম্যি নেই। এই-যে নিরবচ্ছিন্ন ভোগসর্বস্ব স্বশ্রেণীগতপ্রাণ নাগরিক ইঙ্গবঙ্গীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, এ সমাজের সৃষ্টিই হয়েছে বাংলা দেশের জাতীয় ধারার সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টির জন্য। ইংরেজ শাসনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজের পুষ্টি ঘটেছে। গোড়ায় যে আদর্শবাদ এই সমাজের বিকাশের মূলে সক্রিয় ছিল, কালের প্রহারে সেই আদর্শবাদ জীর্ণশীর্ণ হয়ে বিশ শতকে তার খোলসটুকু মাত্র বাঁচিয়ে রেখেছে। সমাজে যারা ধনের উৎপাদনকারী, সেই কৃষি ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে এঁদের চেতনা আছে কি নেই, এমনই নীরন্ধ্র এঁদের স্বশ্রেণীপ্রেম ও আত্মকেন্দ্রিকতা।

এই শ্রেণীর ভোগমুখী নগরবদ্ধ সমাজকে আশ্রয় করেই বাংলা দেশে মধ্যবিত্ত মানসিকতা মুখ্যতঃ পুষ্ট হয়েছে। এই মানসিকতারই ফল 'ভারতী' সাহিত্য ও 'কল্লোল' সাহিত্য। আধুনিক কালে কলকাতা শহরের আবহাওয়ায় পুষ্ট এক ধরনের শিশু-সাহিত্যকেও এই পর্যায়ে ফেলা যায়। এ সাহিত্যের মেজাজের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় মেজাজের আদৌ কোন মিল নেই। এ সাহিত্যের রস মূলতঃ বিজাতীয়, এর ভিতর হাল্কা-চটুল মধ্যবিত্ত মানসিকতারই জয়জয়কার। শহুরে শিশু-সাহিত্যের ধারাধরনের মধ্যে বাংলা দেশ অনুপস্থিত; শুধু কলকাতার আধা-বিলাতী 'স্নবিশ' বাঙালী সম্প্রদায়ের মনোভঙ্গিটাই ওই সকল রচনায় মূর্তি লাভ করেছে, এই মাত্র বলা যায়। সমকালীন বাংলা শিশু-সাহিত্য ষোল-আনার উপর সতেরো-আনা শহুরে। শিশু-সাহিত্যের ওই শহুরেপনার উৎস বিজাতীয়তায় ও মধ্যবিত্ত মানসিকতায়, সে কথা বলা দরকার।

সাহিত্যে গণতন্ত্র

বিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধোত্তর যুগে সকল দেশের সাহিত্যেরই একটি প্রধান লক্ষণ হল গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ ও ধ্যান-ধারণা প্রতিটি অগ্রসর সাহিত্যের উপর তার গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। বাংলা সাহিত্যেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলতে তার সু-উচ্চারিত গণতান্ত্রিক প্রবণতাকেই বোঝায়। গণতন্ত্র ও মানবতাবাদ এই দুই প্রধান স্তম্ভের উপর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সৌধ-শীর্ষ দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুতঃ, গণতন্ত্র ও মানবতাবাদ, খতিয়ে বিচার করলে, একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। ও দুটি আদর্শের মধ্যে নিবিড় সংযোগসূত্র বিদ্যমান। যেখানেই গণতন্ত্র সেখানেই মানবতাবাদের আভাস পুষ্ট। ও দুটি আদর্শকে অভিন্ন বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলা সাহিত্য বর্তমানে এই আপাতযুগ্ম কিন্তু চূড়ান্ততঃ অভিন্ন ভাবাদর্শের দণ্ডের উপরই প্রধানতঃ ঘুরপাক খাচ্ছে।

কিন্তু সাহিত্যে গণতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়ণের রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই মনে নানা রকম অস্পষ্ট ধারণা আছে। লেখকদের একাংশের ধারণা, সাহিত্যের ভাষাভঙ্গির মধ্যে যত বেশী আটপৌরে, ঘরোয়া চলতি শব্দের অবতারণা করা যায় ততই সাহিত্যে গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়। আমরা দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনে যে-সকল শব্দ স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করে থাকি, সেই-সকল কথ্য রীতির শব্দকে সাহিত্যে হুবহু প্রকাশ করাকে এঁরা গণতান্ত্রিক আদর্শের একটি প্রধান লক্ষণ ও অভিব্যক্তি মনে করে থাকেন। এঁদের প্রস্তাব, 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র ধরনে আজকের বাংলা সাহিত্যের ভাষাভঙ্গি রূপায়িত হোক। যেহেতু 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' কিংবা এ-জাতীয় অন্যান্য বইয়ে কথ্য ভাষার শব্দের একান্ত প্রাদুর্ভাব, সেইহেতু এঁরা এই বইগুলিকে গণতান্ত্রিক আদর্শের পথে অগ্রগমনের দিক্‌চিহ্ন হিসাবে নির্দেশ করতে চান। অত্যন্ত সহজ সাধাসিধে ঘরোয়া, প্রায়শ-অমার্জিত কথ্যভঙ্গির শব্দগুচ্ছকে সাহিত্যের পাতে জাতে ঠেলে তোলার মধ্যেই এঁরা গণতান্ত্রিক আদর্শের জয়ধ্বনির আভাস পান। এঁরা 'রব'-এর পরিবর্তে 'আওয়াজ' তোলবার পক্ষপাতী, 'যুদ্ধ' বা 'সংগ্রাম' শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে 'লড়াই' বা 'হামলা' লিখে লেখনীর শিরায় শিরায় এক নতুন যুদ্ধজয়ের রোমাঞ্চ

অনুভব করেন। 'সুযোগ'-এর বদলে 'মউকা,' 'পতাকা'র বদলে 'ঝাণ্ডা,' 'রক্তে'র বদলে 'খুন' ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারের দ্বারা এঁরা বাংলা সাহিত্যকে ক্রমশঃ জনসমীপবর্তী করে তোলার আত্মপ্রসাদে টইটুম্বুর হয়ে আছেন। কিন্তু এই আত্মপ্রসাদ আত্মপ্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছু নয়। শব্দ-সম্ভারকে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারের ভাষার দ্বারা সংস্পৃষ্ট করলেই সাহিত্যে গণতন্ত্রকে আবাহন করা হয় না। গণতন্ত্র ভাষায় নয়, গণতন্ত্র মনোভাবে। যদিও ভাষা মনোভাবেরই প্রকাশ, তবু ভাবের দ্বারাই প্রধানতঃ গণতন্ত্রের প্রভাব স্থিরীকৃত হয়ে থাকে, হওয়া উচিত।

যাঁরা বলেন প্রাচীনকালের ধর্মপ্রচারকগণ জনগণের ভাষায় ধর্মপ্রচার করেছেন এবং ওই সূত্রে নিজ নিজ অঞ্চলে সমৃদ্ধ গণসাহিত্যের সূত্রপাত করেছেন, সুতরাং গণভাষা অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষার মধ্যেই সাহিত্যে গণতান্ত্রিক আদর্শের মুক্তি—তাঁরা ঠিক কথা বলেন কিনা সন্দেহ। ধর্মের পথ আর সাহিত্যের পথ এক নয়। ধর্মের বেলায় যে রীতি গ্রাহ্য, সাহিত্যের বেলায় সে রীতি গ্রাহ্য নাও হতে পারে। লোকশিক্ষা ধর্মপ্রবর্তকগণের একটি প্রধান লক্ষ্য। ধর্মের মূল বাণীগুলি যাতে জনসাধারণ সহজে বুঝতে পারে সেইজন্য ধর্মপ্রচারকগণ সহজবোধ্য ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রাকৃতভাষা ব্যবহার তাঁদের হাতে ধর্মশিক্ষা তথা লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায় ছিল। কিন্তু সাহিত্যের সমক্ষে সে রকম লক্ষ্য বোধ হয় বিলম্বিত নেই। লোকশিক্ষা সাহিত্য-পাঠের একটি গৌণ ফল হতে পারে, কিন্তু লোকরঞ্জনই সাহিত্যের প্রধানতম লক্ষ্য। সাহিত্যের এই ঘোষিত লক্ষ্য সাধনের জন্য সব সময়ই যে আটপৌরে ভাষারীতির আশ্রয় নিতে হবে তার কোন মানে নেই। বরং সাহিত্যিক অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, আটপৌরে ভাষারীতির শব্দগুচ্ছের বহুল প্রয়োগ, কথ্য বাচনভঙ্গির আত্যন্তিক ব্যবহার সাহিত্যের সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠবকে অনেকখানি পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করে। সাহিত্যের একটি প্রধান সম্পদ হল তার ধ্বনি। এটি যে শুধু কাব্যের বেলায়ই সত্য তাই নয়, সকল প্রকার উৎকর্ষ-চিহ্নমণ্ডিত সাহিত্যসৃষ্টির বেলাতেই এ কথা সমান খাটে। উৎকৃষ্ট গদ্যরচনা ধ্বনিসম্পদবিরহিত নয়। ধ্বনির সৌকুমার্য, লালিত্য ও গাম্ভীর্য গদ্যপদ্য যে কোন শ্রেষ্ঠ রচনার প্রধান একটি লক্ষণরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত।

এখন, ভাষারীতির গণতান্ত্রিকীকরণকে অর্থাৎ আটপৌরে ভাষার বহুল ব্যবহারকে যাঁরা সাহিত্যে গণতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপনের পথে একটি সুস্পষ্ট

পদক্ষেপ বলে মনে করেন, তাঁরা সাহিত্যের এই ধ্বনিসৌকুমার্যের দিক্‌টির সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত আছেন বলে মনে হয় না। সাহিত্যের একটি নিজস্ব আভিজাত্য আছে। দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের দ্বারা এই আভিজাত্য লালিত ও বর্ধিত হয়েছে। সাহিত্যের এই আভিজাত্যের একটি প্রধান স্তম্ভই হল শব্দ-ব্যবহারের কৌলীন্য। দীর্ঘকালের অনুশীলনের ফলে যে সকল শব্দ ও বাক্যরীতি স্থির-নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে এবং উপযুক্ত ভাবানুষঙ্গের দৌলতে যাদের ভিতর গূঢ় অর্থব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে, সেই সকল শব্দ ও বাক্যরীতির পথচিহ্ন অনুসরণ করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। নবতন গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রেরণায় অত্যুৎসাহী হয়ে আমরা ইচ্ছা করলেই সাহিত্যের এই স্থির-নির্দিষ্ট রূপের ডোল পাল্টে দিতে পারি না। নবাগত গণতান্ত্রিক আদর্শকে মান্য করতে গিয়ে যদি সাহিত্যের ঐতিহ্যাশ্রয়ী সুসংহত রূপরীতির সঙ্গে পদে পদে বিরোধ বাধে তা হলে ওই অত্যুৎসাহী গণতন্ত্রের মধ্যে কোন ফাঁকি আছে কিনা সেটি আমাদের ধীর চিত্তে বিবেচনা করে দেখতে হবে। সাহিত্যের স্বধর্ম ও প্রাণসত্তাকে সর্ব অবস্থায় রক্ষা করা চাই।

আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না। সাহিত্যে গণতান্ত্রিক আদর্শের আমি আদৌ বিরুদ্ধাচারী নই। বরং আমাদের সাহিত্যের মানসিকতার উপর গণতান্ত্রিক প্রভাব আরও ব্যাপক ভাবে কেন বিস্তৃত হয় না এই নিয়ে আমার মনে আক্ষেপ আছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি পক্ষপাত আছে বলেই সাহিত্যের ঐতিহ্যাশ্রয়ী রূপকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ভাষাভঙ্গির ভিতর ঢালাও ভাবে আটপৌরে কথ্যরীতির আমদানি করতে হবে—এমন নৈরাজ্যকে প্রশ্রয় দিতে আমরা আদৌ রাজী নই। গণতান্ত্রিক আদর্শের পায়ে গড় করতে গিয়ে সাহিত্যের যে একটি প্রধান সম্পদ ধ্বনিময়তা, তাকেই যদি আমরা হারালুম তা হলে এই নিছক গণতন্ত্র দিয়ে আমাদের কী চতুর্বর্গ ফল লাভ হবে? সাহিত্যের আভিজাত্য ও কৌলীন্য এবং সাহিত্যে গণতান্ত্রিকতা এই দুই বিকল্পের মধ্যে আমাদের একটিকে যদি বাছাই করে নিতে বলা হয় তা হলে অবশ্যই আমরা আভিজাত্যকে আঁকড়ে থাকব। কারণ আভিজাত্য সাহিত্যের স্বধর্মের সঙ্গে জড়িত; আর গণতান্ত্রিকতা সাহিত্যের উপর বাইরে থেকে আরোপ করা একটি বস্তু। সাহিত্যের সঙ্গে গণতান্ত্রিক আদর্শের আবশ্যিক কোন যোগ নেই। যুগ থেকে যুগে সাহিত্যের মানসিকতার বিবর্তন হয়ে এসেছে: কখনও সাহিত্য রাজতন্ত্রের পোষকতা করেছে, কখনও

ধনিকতন্ত্রের, আর এ যুগে সাহিত্য গণতান্ত্রিক আদর্শের সেবায় নিয়োজিত হয়েছে। যুগপ্রভাবই এর কারণ। সাহিত্যের মূল নীতির সঙ্গে এই সকল পরিবর্তমান আদর্শের বাধ্যবাধকতার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ধ্বনি শব্দৈশ্বর্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ইত্যাদি সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ বলে গণ্য। এ সকল বৈশিষ্ট্যের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিছক গণতন্ত্রকে সাহিত্যের ভিতর জয়যুক্ত করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। ধ্বনিরিক্ততার আবহাওয়ার মধ্যে সাহিত্যের প্রাণ আইঢাই করতে থাকে। সাহিত্যের স্বধর্ম আগে, তারপর গণতন্ত্র। সাহিত্যের স্বধর্ম রক্ষা করে এ যুগের প্রবহমান ভাবাদর্শ গণতন্ত্রকে যদি আমরা সাহিত্যের ভিতর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি তা হলে অবশ্যই সেটি একটি বাঞ্ছনীয় প্রয়াস বলে সর্বত্র অভিনন্দিত হবে। কিন্তু সাহিত্যের স্বধর্মের হানি করে, তার চিরন্তন আভিজাত্যময় সত্তার বিকার ঘটিয়ে গণতন্ত্রের অত্যুগ্র আবাহন নৈব নৈব কর্তব্য।

আমাদের কথা হচ্ছে, আমরা গণতন্ত্রের আদর্শকে মান্য করব; বাংলা সাহিত্যে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার আরও যাতে প্রসার হয় তার জন্য সচেষ্ট থাকব, গণতান্ত্রিক আদর্শকে বাংলা সাহিত্যের একেবারে কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আমাদের প্রগতিশীল প্রত্যাশা একান্তভাবেই পরিতৃপ্ত হবে; কিন্তু সাহিত্যের ঐতিহ্যসম্মত রূপকে অগ্রাহ্য করে ওই উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য আমরা চেষ্টিত হব না। সাহিত্যের ভাষারীতির মধ্যে গণতান্ত্রিকতা নিহিত থাকে না, নিহিত থাকে তার ভাবজীবনের মধ্যে। সাহিত্যের এই ভাবজীবনকে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা যত বেশী আমরা অনুস্যূত ও অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারব ততই বাংলা সাহিত্যে গণতন্ত্রের জয়জয়কার রব উত্থিত হবে। নির্যাতিত শোষিত অবহেলিত মানবের প্রতি আমাদের অন্তরে যে স্বাভাবিক সহানুভূতির উৎস নিহিত আছে, তার ধারাকে আমরা সাহিত্যের মাধ্যমে দিকে দিকে উন্মুক্ত ও উৎসারিত করে তুলব; কিন্তু শব্দের ধ্বনিসম্পদ বিসর্জন দিয়ে নয়, ঐতিহ্যক্রমাগত ও সুপ্রচলিত বাক্যরীতির বিকার ঘটিয়ে নয়, এক কথায় সাহিত্যের কৌলিক আভিজাত্যকে ক্ষুণ্ণ করে নয়। রকের ভাষা, বস্তির ভাষা আর খিস্তি-খেউড়ের ভাষা অবিকৃতভাবে সাহিত্যে আমদানি করলেই যদি সাহিত্যের রূপ গণতান্ত্রিক হত তা হলে আর কথা ছিল না। প্রচলিত গণজীবনের স্তরে নেমে গিয়ে তার অমার্জিত ভাষারীতিকে সাহিত্যে প্রমোশন দিলেই সাহিত্যে গণতান্ত্রিক আদর্শের জয়

সূচিত হয় না। গণজীবনের রুচিকে সৌন্দর্যানুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উন্নীত করার মধ্যেই প্রকৃত গণতন্ত্রের সাধনা নিহিত রয়েছে বলে আমরা মনে করি। সাহিত্যক্ষেত্রে নিছক গণতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়ণের মধ্যে বিশেষ কোন শক্তির পরিচয় নেই। সাহিত্যের স্বধর্মে স্থিত থেকে গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করলে তবেই তা আদর্শ সাহিত্যসৃষ্টি রূপে পরিগণিত হওয়া সম্ভব।

সাহিত্যের পূর্বাচার্যগণ গভীর নিষ্ঠা ও অনুশীলনের দ্বারা যে ভাষাসৌধ উত্তুঙ্গ করে তুলেছেন ইচ্ছা করলেই আমরা তাকে ধূলিসাৎ করতে পারি না। তাঁদের প্রদর্শিত রেখাচিহ্ন অনুশীলন করেই আমাদের সম্মুখপথে অগ্রসর হতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পালগণ ভাষারীতির একটি সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকার স্বরূপ আমাদের হস্তে অর্পণ করে গেছেন। এই ভাষারীতির একটি প্রধান উপকরণই হল তার ধ্বনিসম্পদ। তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সুসম সামঞ্জস্য ও তৎসঙ্গে দেশজ শব্দের নিপুণ যোজনার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের এই ধ্বনিসম্পদ গড়ে উঠেছে। এই ঐতিহ্যের মূল বহু দূর-কালে প্রোথিত। ভারতীয় ভাষা সমূহের আদি মাতা সংস্কৃতের স্তন্যরসে এই ঐতিহ্য পুষ্ট হয়েছে। একে অগ্রাহ্য করার অর্থ বাংলা সাহিত্যের প্রাণের মূলে আঘাত করা। নতুন নতুন শব্দের উদ্ভাবন ও ব্যবহারের দ্বারা আমরা অবশ্যই প্রচলিত ভাষার ভাণ্ডারকে সমধিক ঐশ্বর্যময় করে তুলব। কিন্তু প্রচলিত বাক্যরীতির ভোল সম্পূর্ণ পাল্টে এ কাজ করতে গেলে সেই চেষ্টা দুচেষ্টায় পরিণত হবে। পরিতাপের বিষয়, আমাদের লেখকশ্রেণীর একাংশকে এই দুশ্চেষ্টার আবেশ পেয়ে বসেছে। তাঁরা সাহিত্যে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা প্রবর্তনের অজুহাতে সাহিত্যকে vulgarize করে তোলার অপসাধনায় মেতে উঠেছেন। সাহিত্যকে প্রাণবন্ত আর বাস্তবসম্মত করে তোলবার যুক্তিতে তাঁরা রকের ভাষা আর বস্তীর ভাষাকে জাতে তোলবার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার দ্বারা কি কখনও গণতান্ত্রিক আদর্শের আবাহন সম্ভব? সাহিত্যকে অশালীন আর ক্রমশ অমার্জিত করে তোলাতেই কি গণতন্ত্র নিহিত? এই যে আজকাল একশ্রেণীর লেখক সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে, ধ্বনির প্রতি অবহিত না হয়ে নিতান্ত আটপৌরে ধ্বনিরিক্ত অমার্জিত লৌকিক ভাষা-

রীতিকে আঁকড়ে ধরেছেন, এর দ্বারা কি সাহিত্যে গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ততর হচ্ছে? তাঁরা ধীরচিত্তে বিবেচনা করে দেখুন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা উত্তরের প্রত্যাশা করব।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা ভেবে দেখবার আছে। শব্দের দুটি রূপ—একটি তার বাচ্যার্থের রূপ, আর একটি তার ব্যাঙ্গ্যার্থের রূপ। প্রথমটির চেহারা আক্ষরিক; দ্বিতীয়টির গূঢ়। প্রত্যেক শব্দের আপাত-প্রতীয়মান আকৃতির তলায় গভীর ব্যঞ্জনা সংগুপ্ত থেকে। দীর্ঘকালীন অনুশীলনের প্রসাদে শব্দের ভিতর এই ব্যঞ্জনার সঞ্চার হয়। বহুল ও বারংবার ব্যবহারের দ্বারা শব্দের মধ্যে যে ভাবানুষঙ্গের (association of ideas) সৃষ্টি হয় তা শব্দকে গভীর অর্থে অর্থান্বিত করে তোলে। শব্দের আপাত-প্রতীয়মান রূপের অন্তরালে এইভাবে নিগূঢ় অর্থের সংক্রমণ হয়। ফল্গুধারার মত শব্দের আক্ষরিক অর্থের তলায় গূঢ়ার্থের স্রোত নিঃসাড়ে প্রবাহিত হতে থাকে। নিঃসাড় কিন্তু একেবারে অলক্ষ্য নয়। ধ্বনি সম্বন্ধে যাঁর কান কিছুমাত্র সচেতন, তিনিই এই অন্তরালবর্তী শব্দার্থের ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনি শুনতে পান।

যাঁরা সাহিত্যে পূর্ব-ঐতিহ্য-বিবর্জিত নিরবচ্ছিন্ন গণতান্ত্রিক ভাষারীতি প্রবর্তনের একান্ত পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন, তাঁরা শব্দের এই ভাবানুষঙ্গজনিত অর্থসম্পদের মূলে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করছেন। তাঁরা সাহিত্যের খোল-নৈচে বদলাতে গিয়ে সাহিত্যের প্রাণসত্তাকেই বিসর্জ্জন দিতে বসেছেন। এই বিপত্তির বিষয়ে অবহিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সাহিত্যে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রচারের পথে কোন বাধা নেই। প্রচলিত মধ্যবিত্ত মানসিকতার অন্ধকূপ থেকে আমাদের বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করে তার ভিতর আরও বেশী বৈপ্লবিক মনোভাব সঞ্চারে আমাদের অবশ্যই সচেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু এ কথা বলা এক আর সাহিত্যকে তথাকথিত অর্থে স্বাভাবিক, গণতান্ত্রিক, বাস্তবসম্মত করবার নামে কোমর বেঁধে রকের ভাষা চালাবার চেষ্টা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য যাঁরা ধরতে পারেন না তাঁরা সাহিত্যকে বাস্তবসঙ্গত করতে গিয়ে সাহিত্যের ক্ষতিই করেন।

॥ নির্ঘণ্ট ॥